রাজবাড়ি জেলা

মা ও বোনকে আটকে আগুন দেয়

আমি দশম শ্রেণির বাণিজ্য শাখার ছাত্র। আমি মুক্তিযুদ্ধের মর্মান্তিক দিনগুলো সম্বন্ধে প্রতিবেশী এক দাদার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারি। যারা এই দেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি তাদের কাহিনী শুনেছি। আমি যার কাছে ৭১-এর কাহিনীটি শুনি, বলতে গিয়ে তার চোখ অশ্রুতে টলমল করে ওঠে। সেই সাথে আমিও খুব দুঃখ পাই।

তিনি এভাবে '৭১-এর ঘটনা বললেন:

আমার বয়স তখন ১৬ কি ১৭। আমি ছাত্র ছিলাম। আমাদের অবস্থা ছিল খুবই কষ্টের। আমার বাপ, চাচারা রাজবাড়ীতে গিয়ে ব্যবসা করতেন। আমাদের এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না। চারদিকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি। আমার এবং অন্যদের স্কুলে যাওয়াই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। রাজবাড়ী হতে রামদিয়ায় ট্রেন চলত। একদিন হঠাৎ পাকহানাদার বাহিনী ট্রেন হতে নামতে শুরু করলো। ট্রেন ভর্তি ছিল শুধু মিলিটারি। ট্রেন থেকে নেমে আস্তে আস্তে তারা আমাদের গ্রামেই আসতে লাগল। বাড়িতে বাবা নেই, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমার ছোট বোনের বয়স ছিল ১২-১৩ বছর। আমার কোনো কিছুর ভয় ছিল না। শুধু আমার মা ও বোনকে নিয়ে ভয়। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, সেই দিন আর কোনো ঝামেলা না করে চলে গেল তারা। বাবা আসার পথে শুনলেন আমাদের গ্রামে মিলিটারির মতো হিংস্র অত্যাচারীরা এসেছে। বাবা ভেবেছেন আমরা কেউই বেঁচে নেই। বাড়িতে এসে আমাদের ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। যাহোক বাড়িতে কোনো খাবার না থাকায় বাবা আমাদের বললেন খাবার খুঁজতে যাবেন। মাঠে গিয়ে কয়েকটি কচু গাছ এনে সিদ্ধ করে দিলে আমরা তা খাই। তারপর শাক সিদ্ধ করে আমরা খেতাম। তখন এমন অভাব দেখা দিল যে প্রত্যেকেই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতো। যদিও সাধারণত মিলিটারির ভয়ে ক্ষুধা তো দূরের কথা, খাওয়ার কথাও মনে থাকত না।

একদিন মিলিটারি আমাদের গ্রামে হানা দেয়। আমার চাচাত বোনকে তারা ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তার ছিন্নদেহ আজও আমার চোখে ভাসছে। আমার চাচাত বোনের মতো আরো অনেকেই নির্যাতিত হয়েছিল।

একদিন আমাদের গ্রামে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদেরকে আমি অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতাম। এক সময় আমার মা ও বোনকে ঘরে আটকে আগুন ধরিয়ে দেয় বেইমানরা। আমি আমার মা ও বোনকে হারানোর বেদনা ভুলব না। শেষে আমরা তিন ভাই ও আমাদের বাবা মিলে মুক্তিবাহিনীর সাথে থেকে তাদের অনেক সাহায্য করি।

আজ আমি গর্বিত যে, আমার শহীদ মা ও বোনের কথা দেশের একটি সম্পদ– মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্টের জন্য বলেছি। আমার মা ও বোনের মতো হাজার হাজার মা ও বোন নির্যাতিত হয়েছেন ও মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। তাদের জন্যই আজ এই দেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীন দেশে বাস করছি।

সূত্র : জ-২৩৯১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সোহেল রানা	**মো. মকছেদ আলী শেখ**
রামদিয়া বিএমবিসি উচ্চ বিদ্যালয়	পিতা:মৃত মো. কেছমত আলী
শ্রেণি-দশম, শাখা-বাণিজ্য	সম্পর্ক - প্রতিবেশী দাদা
	বয়স-৬২, পেশা-কৃষি

এই হালার পো নামাজ কিরে

মানুষের জীবন কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত। তবে সব ঘটনাই স্মরণীয় হয় না। যে ঘটনা স্মৃতির পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায় তাই স্মরণীয়। এখনও নাম না জানা কত মুক্তিযোদ্ধা কালস্রোতের মতো মিশে যাচ্ছে। কেন মিশবে? আমরা কি পারি না তাদের নাম সোনার অক্ষরে লিখে দিতে? তাদের নামকে জাগিয়ে দিতে? কারণ আমরা আজ আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পেরেছি। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি স্বাধীন দেশ। আমরা দেখিনি, তবে আমি আমার দাদির মুখে অনেক গল্প শুনেছি। তখন মনে হয় আমরা কত গর্বিত, যা আমরা উপলব্ধি করি। যখন আমার দাদির নিজের ভাইয়ের কথা বলেন তখন তার চোখে পানি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তাদের স্বজন হারানোর কত যন্ত্রণা আমরা হয়তো জানি না। তবুও তাদের কি গর্ব, দেশকে রক্ষা করতে পেরেছি। আমরা আমাদের মাতৃভাষা ফিরে পেয়েছি। নিজেই অনুভব করি সত্যিই আমরা বড় গর্বিত। আজ আমরা জানিয়ে দিতে পারি আমাদের নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। তাদের নাম ছড়িয়ে যাক মানুষের মুখে মুখে। এমন একজন ব্যক্তির কথা শুনেছি আমার দাদির কাছে, যিনি ছিলেন দেশসেবক। তার কথা ছড়িয়ে দিতে চাই মানুষের কাছে।

ঘটনার বিবরণ:

আজ থেকে ৩৫ বছর আগের কথা। যুদ্ধের সময়, তখন মানুষের মনে শুধু দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা। কত মানুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মানুষ হত্যা করাই ছিল পাক বাহিনীর উদ্দেশ্য। আমার দাদির ভাই, তার নাম ছিল হাছেন মাতব্বর। তিনি ছিলেন দেশের সেবক। তার কথা গ্রামের লোক মানত বা শুনত। তিনি তার গ্রামকে সুন্দরভাবে রাখতেন। তার নাম গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর পাক বাহিনীও ভালো ভালো, দেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী মানুষ আগে মেরেছিল। তিনি যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের কাছে রাখতেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তাদের সাথে গ্রামের লোকজনের উপকার করতেন। তার মনে ছিলো মুক্তির সংগ্রাম। তিনি মৃত্যুকে কখনও ভয় পেতেন না।

আমাদের গ্রামে বাস করত একজন বিহারি। তাকে সবাই বলত মাইকের আব্বা। সবাই এক নামে চিনত। তার সাথে ছিল আমার দাদার দ্বন্দ্ব। মাইকের আব্বা পাক বাহিনীর সাথে চলত, আর সাথে থেকে দেশের লোকজন মারতে সাহায্য করতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের দিন ভোরে পাক বাহিনী এসে আমাদের গ্রামে ভরে গেল। তখন আমার মা ঘুম থেকে উঠেছেন। তাদের পায়ে ছিল বুট। তার শব্দ আমার মা শোনা মাত্র আব্বার কাছে গেলেন। তাকে তাড়াতাড়ি জাগালেন। আব্বা উঠে তড়িঘড়ি করে মাঠে গেলেন। মাঠে ছিল পাট, সেই পাটখেতে লুকিয়ে থাকলেন। ততক্ষণে আমাদের বাড়িতে পাকবাহিনী এসে হাজির। এসে বলতে শুরু করলো, সেই হালা কোথায় গিয়েছে? হালা পালায়েছে। আমার দাদি ভয়ে পাশের বাড়ি যান। পাশের বাড়ির মুরুব্বি বলছে, যাও যাও আমাগোর বাড়ি থেকে যাও। আমাগোর এনে জাগা নেই। তখন তারা কি করবেন? তখন তারাও মাঠের ভিতরে লুকিয়ে থাকলেন। তখনও মাইকের আব্বা বলতে লাগলো, শত্রুর বাচ্চা পালাইছে। আপনারা তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। তখন তাদের নিয়ে চলে গেল।

এভাবে আমার বাবা বেঁচে গেছেন। কিন্তু আমার দাদাকে বাঁচানো যায়নি। ততক্ষণে পাকবাহিনী মাইকের আব্বার সাথে বাড়ি ঢুকে গেল। দাদা ছিলেন বাথরুমে। তারা সরাসরি দোতলায় ওঠে গেল। দোতলায় গিয়ে ঘরের ভিতর যা কিছু ছিল ভেঙে চুরমার করছে আর বলছে, সেই হালার পো কোথায় গিয়েছে। হালার পোলারে ধরন লাগবো। আগে হেঠোর ধুরুন লাগবো। উপরে ছিলো আমার বড় কাকিমা। তাকে জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু কাকী কিছু বলেনি। তাকে তাদের হাতের লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মেরেছে। এসব দাদা শুনছিলেন। তিনি তার বৌমাকে মার দেবার শব্দ শুনতে পেলেন এবং সইতে না পেরে বেরিয়ে আসলেন। বেরিয়ে না আসলে হয়তো তাকে মারতে পারত না। নিজে হাতে ধরা দিলেন। আসতে না আসতেই তাকে ধরে ফেলে। মায়াহীন তারা। তাকে দুই তিনটা বাড়ি মেরেছিল। তখন তারা ধরে বলে, হালার পো চল। তখন আমার দাদা তাদের কাছে

মিনতি করেছেন, আমাকে একটু সময় দিন, আমি ফজরের নামাজটা আদায় করে যাই। হৃদয়হীন পাক বাহিনী বলে, এই হালার পো নামাজ কিরে? একবারে নামাজ পড়িস। তাকে নামাজ পড়তে না দিয়ে দুই হাত বেঁধে ফেললো। তখন মাইকের আব্বার কাছে মিনতি করলে তাকে ফিরে পাওয়া যেতো। দাদা বলেছিলেন, দেশের জন্য যদি জীবন যায় ভালো, তবু ওর মত মানুষের কাছে নত হবো না। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, তোরা কেউ আমার জন্য ভাবিস না। আর কখনও ওই শয়তানের কাছে আমার জন্য যাবি না। আমি মারা যাই যাবো তবুও দুঃখ নেই। এর চেয়ে ওদের হাতে মরা ভালো। তখন তাকে টেনে নিয়ে আসল এবং গাড়িতে ওঠালো।

তাকে নিয়ে যেয়ে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার আব্বা এবং অনেকে ওনাকে খুঁজেছেন। এত মৃত ব্যক্তিদের মাঝে কাকে খুঁজবে? অনেক টাকা-পয়সা মানুষ আমাদের কাছ থেকে খেয়েছে তাকে খুঁজে দেবে কিন্তু আর কি পাওয়া যায়! তবে পরে জানা যায় পাংশা ব্রিজের নিচে মেরে ফেলে দিয়েছিল। এভাবে তিনি দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন।

এমন আরো অনেকে আছে তাদের এভাবে জীবন দিতে হয়েছে। তখন তাদের খাওয়ার বড় অভাব ছিল। আমার দাদিরা কুমড়া রান্না করে খেয়েছেন, চাল পাওয়া যেত না। তখন কি তাদের খাওয়া ছিল? কোথায় পালাবে কিভাবে নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করবে সেই চিন্তা। আমার দাদি এখনো অনেক কান্নাকাটি করেন। আরো কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে পাক বাহিনী। তাদের ভয় কেউ কখনো করেনি। তাদের মনে ছিল শুধু প্রতিশোধের স্পৃহা।

মন্তব্য:

আমরা কি পারি না এদের নাম ছড়িয়ে দিতে? আসুন আমরা সবাই এদের নাম পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দেই। এদের জন্য আজ আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। আমরা তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং করবো। তারা মরেও আমাদের মাঝে অমর হয়ে বেঁচে আছেন। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বড় হতে চাই যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারি। আর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবের মুখ উজ্জ্বল করে দেশের একজন নাগরিক হতে পারি।

সূত্র : জ-২৬৪৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
বেলী আক্তার	**ওহিরননেসা**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম+পোঃ বহরপুর
গ্রাম +পোঃ বহরপুর	থানাঃ বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী
থানাঃ বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী	বয়স-১১০ বছর, সম্পর্কঃ দাদি

কি গুসাই খবরের কাগজ পড়া হয় না

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ মানুষের জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। **১৯৭১** সালে পাক হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষের উপর অমানবিক অত্যাচার চালায়। তারা অনেক মানুষকে জীবনের তরে শেষ করে দেয়। মানুষের ঘর-সংসার সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে ছারখার করে দেয়। স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়। চোখের সামনে যাকেই পায় তাকেই মেরে ফেলে। একটুও মায়া-দয়া নেই তাদের মধ্যে।

১৯৭১ সাল। তখন আমি ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। একদিন আমার মা রান্নাঘরে বসে রান্না করছে। আমরা মায়ের পাশে ছালা পেতে বসে পড়াশোনা করছি। বাইরে প্রচণ্ড হইচই, এর মধ্যে আমার বাবা এসে বলল, 'তোমরা তাড়াতাড়ি কর, বাজারে পাকবাহিনী এসেছে, যদি কাউকে দেখে তবে মেরে ফেলবে। এখন পালাতে হবে।' আমাকে, আমার মা ও ভাইবোনকে নিয়ে বাবা বাইরে বের হলো। তারপর বাড়ি থেকে অল্প একটু দূরে একটি

বাঁশের ঝাড়ে গিয়ে লুকালাম। বাইরে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ। একটু পরে শুনি বাজারে তিন চার জন লোক পাক হানাদার বাহিনীর গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে। তারপরেই বিহারি ও রাজাকাররা ঢুকল আমাদের পাড়ায়। ঝাড়ের ভেতর থেকে আমরা দেখতে পারছি তারা আমাদের বাড়ি এবং আমাদের পাশের বাড়িতে লুটতরাজ চালাচ্ছে। ঘরের ভেতর ঢোকামাত্র জিনিসপত্র ভাঙার আওয়াজ পেলাম। গরু-বাছুরগুলোকে খুলে নিয়ে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির একজন লোককে তারা গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রচণ্ড মারল। লোকটি জলের জন্য ছটফট করতে করতে মারা গেল। এসব কাণ্ড চোখে দেখা সত্ত্বেও কিছু করতে পারলাম না। তারা চলে যাওয়ার পর আমরা বাড়ি ফিরলাম।

পরের দিন দু'জন রাজাকার এসে বাবাকে বলল, কি গুসাই খবরের কাগজ পড়া হয় না? এভাবে কয়েকদিন কাটতে লাগল। ঘরে খাবার নেই, ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমরা বাড়ি থেকে বের হলাম। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম। মাঝে মাঝে দুই একটা ক্ষেত থেকে বাঙি, তরমুজ, শশা ইত্যাদি ফলমূল তুলে খেতাম। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করতাম। সন্ধ্যা হলে যে কোনো স্কুল-কলেজের বারান্দায় গিয়ে বিশ্রাম নিতাম। আর সকালে উঠে হাঁটতে শুরু করতাম। দেখা যেত, অনেক মানুষ তার শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সন্তানকে কোলে করে, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে ফেলে রেখে চলে যেত। এভাবে দুই মাস ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছালাম। ভারত সরকার আমাদের আশ্রয় দিল এবং পণ্যসামগ্রী দিল। আমাদের খাদ্যের জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি দিল। এসব খেয়ে-পরে আমরা সেখানে কাটালাম। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তারপর আমরা সেই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এলাম।

এক নদী রক্তের বিনিময়ে এবং বহু লোকের মিলিত চেষ্টায় একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল।

সূত্র : জ-২৬৬৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ফাল্গুনী কর্মকার (তৃষা)	**তাপসী গোস্বামী**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পিতা: প্রবোধ চন্দ্র গোস্বামী
শ্রেণি-৭ম, শাখা-খ, রোল-১	বহরপুর, রাজবাড়ী
	বয়স-৪৫

পেলাম না আমার বাবাকে আর সমিকে

আমার জীবনে ভয়ংকর স্মরণীয় একটা ঘটনার কথা এখনো মনে পড়ে। এই ঘটনার কথা মনে হলে আমি এখনো শিউরে উঠি। সে দিন ছিল ১৭ মে। হঠাৎ করে রহিম চাচা চিৎকার করে বাবাকে ডাকতে শুরু করলেন। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে পিছু পিছু আমি আর ভাইয়া আসলাম। রহিম চাচা বলেন, মাস্টার সাহেব আগামীকাল আমাদের গ্রামে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ঢুকবে। তখন বাবা বলেন, এখন দেশের যে খারাপ অবস্থা... সারা দেশে যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানিরা যে অত্যাচার করছে... গ্রামগুলো সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। কত অসহায় মা বোনদের উপর অত্যাচার করছে। কত মায়ের বুক খালি করছে। তখন ভাইয়া বলে উঠল, আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে। বাবা রহিম চাচাকে বললেন, এক্ষুনি বাড়ি যাও। ভাইয়া মাকে ডেকে বললো, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

সকাল বেলা কিছু দেখা গেল না। বিকাল বেলা সবাই চেঁচামেচি করে যে যেখানে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। পাঁচ ছয়টা বড় বড় জিপে করে পাকিস্তানিরা এসে স্কুলের মাঠে ক্যাম্প গড়লো। পরের দিন রাতে শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। আমরা সকলে ভয়ে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলাম। পরে শোনা গেল মুক্তিবাহিনী

পাকিস্তানিদের উপর হামলা করেছিল। এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন। তারপর শুরু হলো পাকসেনাদের অত্যাচার। সবার ঘরে ঘরে পাকিস্তানিরা মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘর-বাড়ি। নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করছে। অসহায় মায়ের সন্তানদেরকে মুক্তিবাহিনী বলে গুলি করে হত্যা করছে। রহিম চাচার ছেলেকে নিয়ে হত্যা করেছে। চাচা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। এই দিকে বাবা ভাইয়াকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একদিন রাতে বুটের শব্দ শোনা গেল পাশের বাড়িতে। খালেক চাচার মেয়ে রহিমার চিৎকার শুনতে পেলাম। বাবা-মা, আমি, সমি আমরা একটা ঘরের মধ্যে বসে থাকলাম। হঠাৎ করে আমাদের বাড়ির উঠানে পাকিস্তানিরা এসে বাবাকে ডাকতে লাগল আর দরজায় লাথি মারতে লাগল। বাবা আমাদেরকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে বললেন মাকে। আমি আর মা যেই বের হয়ে আসলাম, সেই সময় আমাদের সামনের দরজা ভেঙে পাকিস্তানিরা ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি আর মা পিছনের পুকুরের ভেতর লাফ দিয়ে কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম; কিন্তু সমি আর আসতে পারল না। পাকিস্তানিরা সমিকে ধরে ফেলে। আর বাবাকে বলতে লাগল, তোমহারা মুক্তিবাহিনী লাড়কা কাহা হে? বাবা বললেন, আমার ছেলে বেড়াতে গেছে। পাকিস্তানি বলে, তুমনে ঝুট কাহা, তুম ছাচ ছাচ বাতাও, নেহি তো তোমহারা লারকিকো ম্যায় লেজাউঙ্গি। বাবা বারবার বলেন যে, আমার ছেলে বেড়াতে গেছে। আমি একটুও মিথ্যা বলছি না। তখন বাবাকে গুলি করল আর সমিকে ওরা নিয়ে গেল। যখন চারপাশ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন আমি আর মা পুকুরের ভেতর থেকে উঠে এলাম। এসে দেখি বাবা গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে। তাই দেখে আমার মা চিৎকার দিয়ে উঠলেন। সেই সময় বাবা মাকে বললেন, তোমরা তোমার বাবার বাড়িতে চলে যাও।

পরদিন সকালে আমরা নানা বাড়িতে চলে গেলাম। বাবার সেই হাহাকার আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রইল। এমনি কত হতাশার মাঝ দিয়ে কয়েকটি মাস কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমার ভাইয়া দেশ স্বাধীন করে ফিরে এলো। আমরা আবার আমাদের সোনার বাংলাকে ফিরে পেলাম– পেলাম না আমার বাবাকে আর সমিকে।

সূত্র : জ-২৬৭৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রোকসানা আক্তার স্বর্ণা	**সামছুন নাহার**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : মা
নবম শ্রেণি	স্বামী : সিরাজুল ইসলাম
রোল-৪০, শাখা-খ	গ্রাম+পোস্ট: বহরপুর,
	থানা: বালিয়াকান্দী, জেলা: রাজবাড়ী

বীভৎস দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য ঘটে

আজ আর ঠিক দিন তারিখ মনে নেই। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ এইটুকুই মনে পড়ে। অনেক কিছুই বিস্মৃত। তখন আমি ছিলাম অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। একদিন সকালে শোনা গেল মিলিটারি আসছে। কাকা বাজারে চা খেতে যেয়ে ফিরে এলেন। মিলিটারিরা খেয়াঘাট থেকে নৌকা ও মাঝিকে নিয়ে গেছে আসার জন্য। খবর পেয়ে কাকা বাড়িতে এসে খবরটা জানিয়ে এবং আশপাশের যাকে পাওয়া গেল তাদের বলে বাবাসহ আত্মগোপন করলেন। আমরা ছোট ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরদা ও ঠাকুমা বাড়িতে হানাদারদের আতিথেয়তা করবো বলে ব্যবস্থা করে গেলেন। কিছু নগদ টাকা এবং ওষুধপত্রও রেখে গেলেন তারা। মেয়েছেলেরা আশপাশের মুসলমান বাড়িগুলোতে লুকিয়ে থাকল। পাড়ায় রব পড়ে গেল– মিলিটারি আসছে, মিলিটারি আসছে। চারদিকে জলকাদা। খাল-বিল, নদী-নালা জলে ভরাট শুধু নয় জল যেন উপচে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। সে বছর বন্যাটা একটু

বেশি মাত্রায় ছিল। এরই মধ্যে শোনা গেল এসে গেছে মিলিটারি। কেউ খেতে বসেছে, কেউ ভাত উপুড় দিয়েছে। কেউবা টোপলা টুপলি বাঁধছে। কেউ পান গোছাচ্ছে, কেউবা গরু ছাগল নিয়ে ব্যস্ত। এরই মধ্যে কয়েকদল হায়না গ্রামের হিন্দু পাড়ায় হানা দিল। কোনো দলের মাথায় খাকি টুপি, সঙ্গে পথ প্রদর্শক এবং ওদের দোসর মোহাম্মদ মৃধা, গদাই, আরও কেউ কেউ।

আমাদের বাড়ি থেকেই হিন্দু পাড়া শুরু। আমাদের বাড়ির দিকে আসতেই আমি আর আমার এক ছোট বোন অদূরে পুকুরের চালার পান বরজে লুকালাম। আমার ঠাকুরদাদার আপ্যায়ন, নগদ টাকা গ্রহণ ছাড়াও ঠাকুরদাদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তার বয়স ৮৩ বছর। কথায় একটু জড়তা। সঙ্গের দোসর পুকুরের পূর্বপাড় পর্যন্ত নিয়ে গেল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছি। এ সময় সঙ্গের দোসর 'ইয়্যা আদমি বুড্ডা আছে একে ছোড় দো' বলে প্রার্থনা জানালে সেই বেলুচ আর্মির দয়া হয়। দাদাকে একটা চাপড় মেরে ছেড়ে দেয়। সমস্ত হিন্দুপাড়া তিন রাউন্ডে তিনবার তারা চষে বেড়ায় ওদের দোসরদের সহায়তায়। পাশাপাশি গ্রামের লুটেরা ফাঁকে ফাঁকে আড়ালে আবডালে টাকা পয়সা, সোনাদানাসহ আসবাবপত্রও লুটপাট করে। বদমায়েশরা কয়েকজন মা বোনের ইজ্জতও লুট করে। কারণ অসহায় মহিলারা বাড়িতে হায়নার তাড়া খেয়ে বাগানে, বাঁশ ঝাড়ে, পান বরজে আশ্রয় নিয়েছিল, বদমায়েশদের কাছে যা ছিল পোয়াবারো। সমস্ত হিন্দুপাড়া থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাউকে-বা খাবার থেকে, কাউকে-বা মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। কাউকে লুকায়িত অবস্থায় পেয়ে ধরে নিয়ে যায় গ্রামের কালীবাড়ীতে। ধরার সময় লুঙ্গি তুলে পরখ করা হয় হিন্দু কিনা। তবু একজন মুসলমানকে ধরে। এভাবেই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর চলে হায়নাদলের অমানবিক বর্বরতা। একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বাঁশ বাগান, কাঁঠাল বাগান আর পান বরজে লুকানো মা বোনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর চলে বদমায়েশ নেকড়েদের তাণ্ডব এবং লুটেরাদের লুটপাট।

বিভিন্ন বয়সের ২৮ জন হিন্দু গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মুসলমানকে ধরে হাত বেঁধে নিয়ে যায় গ্রামের কালীবাড়ী অঙ্গনে। কালীবাড়িতে ছিল তিনটি ঘর। একটি কালী মন্দির, একটি নাট মন্দির আর একটি মোহন্তের ঘর। কালীমন্দিরের কালী মাতার বেদীর তিন পাশে একের হাতের সঙ্গে অপরের হাত বেঁধে মালার মতো দাঁড় করায়। তাদের ঠিক সামনেই অবস্থিত নাট মন্দিরের মাঝখানে অবস্থিত মঞ্চের মতো উঁচু স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র স্থাপন করে। কালী মন্দিরের দরজায় দুইজন আর্মি বন্দুক নিয়ে সজাগ দৃষ্টিতে দাঁড়ায়। মন্দিরের সামনের রেলিং খুলে ফেলে। তখন আমি পান বরজের মধ্যে একটি গর্তে বোনকে নিয়ে ভয়ে গুটিসুটি মেরে লুকিয়েছিলাম। হঠাৎ একটি বুলেটের শব্দ আমার মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে চলে যায়। আলোর ফুলকি দেখতে দেখতেই পরপর চারটি গুলির শব্দ হলো। আমরা তখন আধমরা। নির্বাক ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে অসাড় পড়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কান্নার করুণ রোল কানে ভেসে আসে। ভয় ও আতঙ্কে কালীবাড়ী গেলাম। সেই আমার জীবনের প্রথম করুণ বীভৎস দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার দুর্ভাগ্য ঘটে, যার বর্ণনা কবির পক্ষেও দুঃসাধ্য মনে হয় আমার কাছে। দেখলাম লাশগুলো মা কালীর চরণে প্রণতি জানাচ্ছে আর লাল তাজা রক্তের স্রোত মায়ের চরণ ছুঁয়ে রাস্তার পাশে পগারের জলে গড়াচ্ছে। উহ্ কী নৃশংস বেদনাবিধুর দৃশ্য! পগারের জল পার্শ্ববর্তী ইছামতির স্রোতে গিয়ে নদীকে করছে রঞ্জিত। এসব দেখা যায় না।

এরই মধ্যে একজনের চিকিৎসা-সেবা চলছে। যার বয়স ৬৩ বছর। পেশায় নাপিত। ডাক নাম আদুলে। প্রথম গুলির সাথে সাথে আদুলে নাপিত তার হাতে হাত বাঁধা সুটকাকে নিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তাই মরেও বেঁচে যায় তারা দুইজন। হানাদার বাহিনী যখন নৌকায় ফেরত যাত্রা শুরু করে তখনই হঠাৎ সুটকা 'জল দে, জল দে' বলে চিৎকার দেয়। হানাদারবাহিনী তা শুনে ফেরত আসে। তখন পুনরায় রাইফেলের গুলি করে দুটি। তাতে সুটকা বেঁচেও মারা যায় আর আদুলের উরুতে গুলি লাগে। হায়রে নিয়তি!

সেই আদুলে ১৩ বছর পর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। আর সবাই সেখানেই আজ চিরনিদ্রিত।
আজ সে কালীবাড়ী নিশ্চিহ্ন। নেই কোনো বেদী। সেখানে স্থাপিত হয়েছে নতুন মালিকের নতুন বাগান। বেঁচে আছে হানাদারদের দোসর মোহাম্মদ। অপর দোসর গদাই বছর খানেক আগে আত্মহত্যা করেছে। আর এক

দোসর কুদরত বিশ্বাসকে স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে হত্যা করে। অন্য দোসররা বহাল তবিয়তে স্বাধীনতার স্বাদ নিচ্ছে। আজ আর সেই হিন্দু পাড়ার অস্তিত্ব নেই। নেই সেই কালীবাড়ির অস্তিত্ব। আছে শুধু বেদনার স্মৃতি আর হাহাকার।

সূত্র : জ-২৬৭৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অনন্তা পাল	**উত্তম কুমার স্বর**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম+ডাক: লক্ষ্মীপুর
শ্রেণি-৯ম, রোল-০৫	থানা: আটঘড়িয়া, জেলা-পাবনা
	সম্পর্ক-কাকা

আমি রাজাকার

আমি রাজাকার। বহরপুর থেকে যখন মার্চ করলাম তখন আমরা দেখি মুক্তি বাহিনীর খুব জোর। তখন মরিচা বাঙ্কার কাটিয়াও মুক্তিবাহিনীর তাপের চোটে লা টিকতে পারিয়া আমরা হামিদ নেয়াজি খানকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গায় আনিলাম। তখন ওসি বলেন, ধর মিসকিন। তখন আমরা বাঙ্কারের ভিতরে লুকিয়ে থাকিলাম। আমাদের সাথে ১০ জন পাক সেনা নিয়োগ করিলেন। তখন আমরা সুমগার আশপাশ খুঁজতে লাগিলাম কোথায় মুক্তিবাহিনী, তাদের ধরিতে লাগিলাম। মেলেটারিরা ৪ জন মিসকিনকে ধরলেন। যখন আরো ঘোরতর খারাপ সময় হলো তখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন বহরপুর। বহরপুর আসার পরে আমরা দেখিলাম মুক্তিযুদ্ধার খুব জোর। তখন আমরা মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া কমান্ডার জিল্লুর হাকিমের কাছে অস্ত্র গুলিগালা সব কিছু বুঝিয়া দিয়া দিলাম বা আত্মসমর্পন করিলাম। আমি আবদুল হান্নান অস্ত্র গুলি গালাস সব কিছু জমা দিয়া মুক্তি বাহিনীর সাথে কাজ করিতে লাগিলাম। দেশ স্বাধীন করিলাম।

সূত্র : জ-২৬৯০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সাবিনা খাতুন	**মোঃ হান্নান মোল্লা**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক-দাদা
অষ্টম শ্রেণি, রোল-২৭	

তোর বাপের গাছে উঠেছিস

সে অনেক দিন আগের কথা। তবু সেই সব ঘটনা এখনও স্মৃতির মণিকোঠরে বাসা বেঁধে রয়েছে। আমার তখন বয়স মনে নেই। তবে আমার বিবাহ হয়েছিল প্রায় ১২ বছর। আমার এক সন্তান তার নাম নিখিল। ছোট বেলা হতেই সে ছিল খুব সাহসী। সব ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল। আমরা সবাই গ্রামে সাধারণত রাত ৮টার সময় রাতের খাবার খাই। রাত্রে চারদিকে বন্দুকের গুলি, বোমা ইত্যাদির শব্দ হতো। চারদিকের গ্রামের লোক প্রাণের ভয়ে আমাদের গ্রামে পালিয়ে আসে। এসব দৃশ্য দেখলেই শরীরের পশম খাড়া হয়ে যেত। জীবনটা মনে হতো যে খুবই অসহায়।

আমার শরীর সকাল হতে একটু খারাপ। আমার পাতলা পায়খানা হয়েছে, সকাল হতেই সমস্যা হচ্ছে। তখন গ্রামে তেমন ডাক্তার ছিল না। তবে বহরপুর গ্রামে একজন ডাক্তার ছিল। তার নাম শংকর ডাক্তার। অসুখের জন্য আমি বহরপুরের ডাক্তার শংকর-এর কাছে আসছিলাম। কিন্তু তার বাড়ির কাছে বিহারিরা হিন্দু সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের গায়ে ডিজেল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারছে। তখন আমার দেহের সব অঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল। ওই ঘটনার পর আমি বাড়ি ফিরে আসলাম। ফিরে আসবার পর আমার এলাকার লোকজনের কাছে সব কিছু বললাম। তারা কিছু কিছু লোক তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। একে একে লোকজন সবাই চলে যেতে লাগল। আমরাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে সকাল হয়ে আসল। আমার স্বামী, আমি নিজে আর আমার সন্তান সবাই প্রস্তুত হলাম। আমরা গেলাম আমাদের পাশের গ্রাম পাকালিয়া, আমাদের পরিচিত একজন ব্যক্তির বাড়িতে। আমরা ওই বাড়িতে কিছু সময় কাটালাম। সেই বাড়িটা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। আমরা কিছু সময় পরে দেখি আমার সন্তানটা নেই। আমি মনে মনে ভাবলাম হয়তবা আবার সে বাড়িতে ফিরে গেছে। আমি খুবই দ্রুতবেগে বাড়ি এসে দেখলাম আমাদের সেই বড় আম গাছে আমার ছেলে উঠে আম পাড়ছে। আর গ্রামের একজন লোক ছোরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিচে। তাকে ভয় দেখিয়ে বলছে, 'এই নাম, তোর বাপের গাছে উঠেছিস?' আমি ঘটনা দেখবার পর আমার সন্তানটাকে নামিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ না করে ফিরে এলাম সেই বাড়িতে। রাতটা কাটল না তাদের বাড়িতে। তারা নিজেরা বলল, মা, তোমরা এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। তা না হলে, গ্রামে বিহারি ঢুকে পড়েছে, হয়তবা তোমাদের উপরে আঘাত হানতে পারে। এই কথা শোনার পর রাতের খাবারটা আমাদের পেটে পড়ল না। ওইভাবেই আমরা বাড়িটা ত্যাগ করলাম। তারা আমাদের বাড়ি ত্যাগ করার জন্য সহায়তা করলেন।

আমরা ওই বাড়ি ত্যাগ করে ওই রাতে আমাদের এক আত্মীয় বাড়ি গেলাম। তারাও এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেখান হতে আমরা খাগুরে গেলাম ওই রাতে। যাবার পর দুপুর বেলা আমরা সবাই দুপুরের খাবার খেতে বসেছি, কিন্তু খাওয়া হল না। আমাদের চারদিকে গুজব রটল যে মিলিটারি গ্রামে এসেছে। খাবার সব কিছু নিয়ে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। সেখান হতে অনেক লোক একত্রে ভারতের দিক পালিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। আমাদের সাথে ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র। কিন্তু টানার কষ্টে সেগুলো নেওয়া সম্ভব হলো না। সকল প্রকার প্লেট, সব ফেলে দিতে হলো গড়াই নদীতে। তারপর আমরা বর্ডারের নিকটে এক স্কুলে উঠলাম। রাত ওখানেই কাটল। সকালে আমরা প্রস্তুত হলাম গড়াই নদী পার হওয়ার জন্য। যার যার জীবন নিয়ে সে পার হতে লাগল। কোনো মায়া ছিল না কারো প্রতি। এমন কি পার হওয়ার জন্য নিজের মাকে অনেকে ফেলে রেখে গেল। পার হতে বর্ডারের এপারে এক মুসলমান বাড়িতে রয়ে গেলাম। সেই বাড়ির অভিভাবক আমাদের পার করার জন্য ১০০ টাকা করে নিল প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে। এক এক দলে প্রায় ১০০০ লোক কিন্তু সে আমাদের পার করে দিল না। সে মিলিটারির ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা অসহায় হয়ে পড়লাম। কিন্তু তখন আমাদের মনে একটু সাহস হলো। আমরা সবাই পার হবার জন্য ওখানেই রাত কাটালাম। রাত কাটল না, রাত ১০টায় কলার ভেলায় পার হলাম। পার হয়ে ওপারে উঠলাম। উঠে বসে রইলাম রাত পোহানোর জন্য। রাত পোহাবার পরে শরীরের কাপড় নাড়লাম শুকানোর জন্য। সকল কাপড় শুকালাম এবং হালকা কিছু নাস্তা করলাম। নাস্তা করার পর ১০টার দিকে রওনা দিলাম দমদম বর্ডারে। সেখানে গিয়ে দেখি শরণার্থীদের ডাক দিচ্ছে খাদ্য নেওয়ার জন্য। সেখান থেকে এক গ্লাস গুড় আর এক কৌটা চিড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে কৃষ্ণনগর গেলাম। সেখানে গেলে আমাদের এক ধরনের স্লিপ প্রদান করল প্রত্যেক পরিবারের একটা করে। এই স্পিপ্র আমাদের চাল পাবার জন্য। আমরা কল্যাণী ক্যাম্পে গিয়ে চাল এবং ডাল ওঠালাম।

ওই দেশ হতেই আমরা শুনতে পেলাম বাংলাদেশে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। দেশের লোক না খেয়েও দিন যাপন করছে। আরো শুনলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমরা ভারতে ছয়

মাস কাটালাম। পরে আমরা দেশে ফিরে এলাম। এসে দেখলাম আমাদের বাড়িতে কিছুই নেই। স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু আমরা সবাই সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। তবু অনেক খুশি আমরা সবাই।

সূত্র : জ-২৭১০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অপুর্ব কুমার	**ময়নামতি**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	স্বামী- দেবেন্দ্র নাথ
শ্রেণি : দশম	গ্রাম : বহরপুর
	সম্পর্ক : ঠাকুরমা

তুমি ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও

যদিও আমি সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না, তবু যুদ্ধে আমার অবদানের কমতি ছিল না। একদিন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আসরের নামাজ শেষ করে শুনতে পেলাম কয়েকজন রাজাকারসহ পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের গ্রামে আসছে। সংবাদ শোনার পর তোর দাদিসহ পাঁচ ছেলেমেয়েকে পাশের পাট ক্ষেতে আশ্রয় নিতে বললাম। এদিকে পাশের রহমতের বাড়িতে সংবাদ দেওয়ার আগেই দেখি এক গাড়ি হানাদার সৈন্য এসে আমাদের বাড়ির সামনে নামল। তাদের মধ্যে দুইজন আমার পরিচিত রাজাকার। আমার বড় ছেলে মানে তোর আব্বু একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমাকে দেখিয়ে দিয়ে রাজাকার দুইজন বললো, হুজুর এ মুক্তিযোদ্ধার পিতা হ্যায়!

পাকিস্তানি সৈন্যরা একজন রাইফেল উঁচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'তুমকো মুক্তিযোদ্ধার পিতা হ্যায়?' আমি সবেমাত্র আসরের নামাজ শেষ করায় আমার হাতে তজবি ও মাথায় টুপি ছিল, তাই সালাম দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, জী হুজুর, আমি মুক্তিযোদ্ধার পিতা হ্যায়। তবে জানি না আমার ছেলে কোথায়। সাথে সাথে নির্দয় পাষণ্ড আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিল এবং বুকের উপর পা দিয়ে বললো, শালা তোকে খতম করে গা, জরুর তোর ছেলেকে লিয়া।

ইতিমধ্যে একজন রাজাকার বললো, হুজুর পাশের বাড়ি খুব সুরত জেনানা আছে। শুনে পাষণ্ড আমার বুকের উপর থেকে পা নামিয়ে বললো, বহুত আচ্ছা, জলদি চলেগা। এই বলে পাশে রহমতের বাড়িতে গেল। এদিকে রহমত একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় সে বাড়ি ছিল না। ছিল তার স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় মেয়েটা বিয়ের উপযুক্ত, ১৬-১৮ বছর বয়স তার। দেখতে খুবই সুন্দরী, নাম তার রেশমা। আমি বহু কষ্টে উঠে আমার গরুর গোয়ালের মধ্যে গিয়ে ডাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি রাজাকার দুইজন মেয়েটিকে দেখিয়ে ছেলে দুটিকে বললো, গাছ থেকে ডাব পাড় শালা, আমরা খাব। এদিকে দুই পাষণ্ড সৈন্য একজন রহমতের স্ত্রীকে ধরেছে এবং অপরজন রেশমাকে ধরেছে। বাঘের হিংস্র হায়নার মত চোখ। রহমতের স্ত্রীর কোলে তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে চিৎকার দিয়ে কাঁদছে। রহমতের স্ত্রী কান্নাকাটি করে পাষণ্ডের পা জড়িয়ে ধরতে গেলে পাষণ্ড তার কোলের বাচ্চাকে বুক থেকে টেনে ছিটকে ফেলে দিয়ে রহমতের স্ত্রীকে রান্না ঘরে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার করতে লাগলো। অন্যদিকে পাট কাঠির বেড়া দেওয়া থাকায় ঘরের রুমে অন্য পাষণ্ড মেয়ে রেশমাকে পাশবিক নির্যাতন চালাতে লাগলো। কী আহাজারী চিৎকার, মনে হচ্ছিল আল্লাহ তুমি এ দৃশ্য না দেখিয়ে আমার মৃত্যু দাও। কিন্তু কি করার, আমিতো নিরুপায়, কিছুই করার নেই। চোখ বুঁজে সব সহ্য করলাম। আর আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম।

পাষণ্ডদের কাজ শেষে উঠানে এসে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে গাড়িতে চলে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি রহমতের স্ত্রী বিবস্ত্র অবস্থায় উঠে আসছে। আমি উঠানে পড়ে থাকা বাচ্চা মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে মেয়ে

রেশমার দিকে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি রেশমা জ্ঞানহীন বিবস্ত্র অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যা দেখে কোনো মানুষ স্থির থাকতে পারে না। রহমতের স্ত্রীকে মেয়েকে দেখতে বলে আমি কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে গেলাম পাশের গ্রামে আতর ডাক্তারের বাড়ি। গিয়ে দেখি বাড়িতে কেউ নেই। সবাই পালিয়েছে। রিক্ত হাতে ফিরে এসে দেখি রহমতের বাড়িতে গ্রামের লোক আর ধরছে না। কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে। মুরুব্বী লোকেরা মেয়েটির জ্ঞান ফিরানোসহ রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য নানা রকম গাছ-গাছড়ার সাহায্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না এবং জ্ঞানও ফিরলো না। শেষ বিদায় নিতে হলো রেমশাকে পাকিস্তানি হায়নার পাশবিক অত্যাচারের কবলে পড়ে। কী এক হৃদয় বিদারক ঘটনা! গ্রামের মানুষ সবাই নিরুপায়। উপকার করতে এসে রেশমাকে জানাজাসহ মাটি দিয়ে ফিরতে হলো সবাইকে। আকাশ, বাতাস, মাটি, জল ভেদ করে সবাই কান্নার রোল নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সবার একই দোয়া, আল্লাহ তুমি রেশমাকে বেহেস্তে নসিব করিও। আর পাকিস্তানি হানাদারদের জাহান্নামে দাও এবং বাংলার বুক থেকে তুমি ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও।

সূত্র : জ-২৪৪৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শামীমা সুলতানা হ্যাপী	**মো. সৈয়দ আলী মণ্ডল**
সাঁজুরিয়া জেহ্‌রা জেরীন উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক-দাদু, বয়স-৭৫
নবম শ্রেণি, রোল-০৫	গ্রাম: সাধুহাটী, পো: বিপ্রবগদিয়া
	থানা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ

আজ পর্যন্ত আমি বিধবা

আমি তখন বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ আমার স্বামী আসল আমাকে নিয়ে যেতে। আমি তার সাথে যাওয়ার মত প্রকাশ করলাম। আমরা দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে রওনা করলাম। সাথে আমার ১২ বছরের একটি বোন। আমার স্বামী আমাদের জন্য একটি গাড়ি ঠিক করে আনলেন। আমরা গাড়িতে উঠে রওনা করলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর আমি দেখতে পেলাম রঙবেরঙের পোশাক গায়ে, মাথায় টুপি কয়েক গাড়ি লোক রাস্তা দিয়ে আসছে। আমাদের গাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়াল এবং আমার স্বামীর সাথে কথা বলতে লাগল। এক পর্যায়ে তারা আমার স্বামীকে মারধর আরম্ভ করল। পরে তাকে ছেড়ে দিল। তারা সন্দেহ করেছিল এটা বিয়ের গাড়ি।

তারপর আমরা বাড়িতে এলাম। আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? আমার স্বামী বললেন, এরা পাকিস্তানি সৈন্য। আমি আবার জিজ্ঞেস করছিলাম যে, তারা কি করতে এসেছে? আমার স্বামী আমাকে সব বুঝিয়ে বললেন। তারপর আমরা শুনতে পেলাম তারা আমাদের গ্রামে ঢুকেছে। সবাই যার যার মতো করে পালালো। আমরা সবাই বাগানের ভিতর লুকালাম। কেউ কনকনে শীতে জড়োসড়ো হয়ে ঘরের এক কোণে লুকাল। আবার কেউ পানিতে ডুব দিল।

তারপর আমরা বাগান থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, মিলিটারিরা আমাদের পাশের বাড়ির খোকন এবং পরিবারের অন্য সবাইকে লাইনে দাঁড় করাল এবং কিছুক্ষণ পর হানাদারের হাতের মেশিনগানটা গর্জে উঠল। নিমেষেই সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এক বছরের একটি শিশু ছিল তাদের বাড়িতে। ছেলেটিকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে দেয়ালের উপর আছাড় মারল। ছেলেটি এক চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর এক পাক সেনা ছেলেটির গলার

উপর পা দিয়ে চাপ দিল এবং তাতেই শেষ নিশ্বাসটুকু ছেলেটির দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরে বাড়িটিতে ঢুকল তারা। তাদের বাড়ির পুরুষ লোকদের মেরে ফেলল। মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাদের কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। আমরা পরে শুনতে পেলাম তারা বহু মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে। চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ। সবাই যখন লাশ কবর দিয়ে ঘরে ফিরল, মিলিটারিরা আবার আসল। আমাদের গ্রামে তারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ঘরগুলো। তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকল। আমার ছেলে-মেয়েকে আমি আমাদের সাববাক্সর মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপের ভিতর লুকালাম। আমাদের বাড়িতে এনে একটি ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমাদের সাথে ছিল আমার ছোট বোনটি। বোনটি আমাদের ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে দেখতে গেল এবং এই তার শেষ যাওয়া, আমরা তা অনুভব করতে পারিনি।

আমার ছোট বোনটিকে তারা গুলি করে মেরে ফেলল। আমরা জ্বলন্ত দুটি তাজা মানুষ দাঁড়িয়ে দেখলাম কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। আমার ছোট মেয়েটিকে যে আমরা সাববাক্সে আটকে রেখেছিলাম তা ভুলেই গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাববাক্স খুলে দেখি আমার মেয়েটা ঘুমাচ্ছে। আমি বুঝতে পারিনি যে, এই ঘুমই তাদের শেষ ঘুম। আমি তাদের ডাকছি কিন্তু তারা কোনো কথা বললো না। আমাদের পরিবারে দুঃখ এসে বাসা বাঁধল। সেই দুঃখে আমার স্বামী মারা গেলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি বিধবা।

সূত্র : জ-২৪৫৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোঃ আফজাল হোসেন (শান্ত)	**জহরা খাতুন**
সাঁজুরিয়া জেহরা জেরীন হাই স্কুল	
শ্রেণি-৯ম, রোল-২	

গামছাটি বুকে জড়িয়ে তিনি কাঁদেন

আগস্ট ১৯৭১। রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বড়বনগ্রাম হাটের উপর আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি হায়েনারা। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে দোকানগুলিতে। গুলি করেও মেরেছে কয়েকজনকে। খবর ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত গ্রামে।

মকিম পাগল ভাত খেতে বসেছিল। মিলিটারির কথা শুনে ভাত রেখে গলার গামছায় কিছু গমভাজা নিয়ে চিবোতে চিবোতে ছুটলো হাটের দিকে। কি কাণ্ড! মিলিটারির ভয়ে গ্রামবাসী ছুটে পালাচ্ছে, আর মকিম কিনা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

মকিম পাগল তবুতো মানুষ। পাকিস্তানিদের মত জানোয়ার তো নয় যে গরিবদের কষ্টের দোকানগুলোকে বিনা কারণে পোড়াতে দেখেও চুপ থাকবে। সে একটি কলসি সংগ্রহ করে পাশের নদী থেকে (সিরাজপুরের হাওর) পানি নিয়ে আগুন নেভাতে গেল। পাগল বলে মিলিটারিরা ওকে সরিয়ে দিলেও সে বারবার আগুন নেভাতে উদ্যত হচ্ছিল। আর মুখে মিলিটারিদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছিল বিশ্রী গালাগাল– 'শালারা! তোদের বাপ দাদার ঘর যে ইচ্ছেমত পোড়াবি, ওইগুলি বানাতে আমাগো কষ্ট হয় নাই?'

মকিম কথা শুনছিল না। মিলিটারিরা ওকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল এবং শুইয়ে ছোরা দিয়ে তাকে পশু কোরবানির মত জবেহ করে ফেললো। তারপর দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল পানিতে।

এদিকে মকিমের মা মরিয়ম লোকের মুখে শুনে ছুটে গেল হাটের দিকে। কিন্তু ব্যর্থ তার সেই ছুটে যাওয়া, শুধু দেখলো ছড়ানো ছিটানো আগুনের চিহ্ন, বুটের লাল দাগ, ছিন্নভিন্ন কয়েকটি লাশ, নদীর ধারে মকিমের গলার

গামছাটি, আর লাল রঙের শান্ত পানি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর শুধু চোখহীন মকিমের মাথাটি ছাড়া আজও কিছুই পাওয়া যায়নি।

চোখের পানিতে হয়তো নদীর পানি বেড়েছে, মরিয়ম অন্ধ হয়েছেন। তবুও পানি পড়ছে অবিরাম। মকিমের গলার সেই গামছাটি বুকে জড়িয়ে আজও তিনি কেঁদে চলেছেন।

সূত্র : জ-২৪৮৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নাজমুন নাহার মিশু	**আঃ ছাত্তার বিশ্বাস**
পাংশা জর্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স-৫৭, সম্পর্ক বাবা
শ্রেণি-দশম, বিভাগ: বিজ্ঞান, রোল-০১	মুক্তিযোদ্ধা

তুই আমাকে বিসর্জন দিস না বাবা

যখন স্বাধীনতা আন্দোলন হয় তখন আমরা বাড়িতে। কিন্তু তারপরই অত্যাচার, লুটতরাজ এবং বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ঐসব দেখে আমরা ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াই। কখন যে আমাদের মারতে আসে! লুটতরাজ শুরু হলে আমরা সমস্ত পরিবার নিয়ে প্রাণের ভয়ে রাত সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং অনেক লোক একত্র হয়ে পালিয়ে যাই। জায়গার নাম জঙ্গলগ্রাম। ওই জায়গায় আমরা আশ্রয় নেই। একদিন ওখানে থাকি। তারপরের দিন পরিবার রেখে আমি গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। এসে দেখি মালামাল বলতে কোনো কিছু নেই। গাছের কিছু পাকা আম পেড়ে গোছাচ্ছিলাম। এমন সময় গ্রামে বিহারি ঢুকে পড়ে। বিহারিদের দেখে আমগুলো ফেলে রেখে ভয়ে দৌড় দেই। আমাকে ধাওয়া করলে আমি জঙ্গলে ঢোকার আগেই আমাকে গুলি করে। তখন আমি পড়ে যাই আর গুলি আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। গড়িয়ে গড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ি। ঐ জঙ্গলের ভিতর সমস্ত দিন একা একা থাকি। রাত্রি হলে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হই। একা একা হেঁটে চলে যাই জঙ্গলগ্রামে। ঐ জায়গায় থেকে পরের দিন জঙ্গলগ্রামের সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে ভারতের দিকে রওনা হই।

জঙ্গলগ্রামে একজন শক্তিশালী লোক কাদের সরদার বাস করত। সে আমাদের সঙ্গে যায়। তার মা ছিল বৃদ্ধ এবং অচল। তার মাকে ঝুড়িতে করে মাথায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে যায়। আমাদের সামনে একটা বড় নদী। নদীটির নাম গড়াই। আমরা সবাই একটা নৌকায় উঠি। নৌকাটি ছেড়ে মধ্য নদীতে গেলে কাদের সরদার তার মাকে বলল, মা তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি। এখন তোমাকে এই নদীতে বিসর্জন দিয়ে যাব। ওই কথা শুনে মা অনেক কান্নাকাটি করতে লাগল। সন্তানের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই আমাকে বিসর্জন দিস না বাবা।' কিন্তু তার মায়ের কথা না শুনে ওই ঝাঁকাটি ধরে নদীতে ফেলে দেয়। কিন্তু পরে কাদের আমাদের সাথে কিছু দূর গেলে গুলি খেয়ে মারা যায়। সে আর ভারতে যেতে পারে না। তাকে ফেলে রেখে আমরা হেঁটে চলে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। পেটের ব্যথায় বমি করতে করতে আমি নিস্তেজ হয়ে যাই। অনেক পরে আমি সুস্থ হয়ে উঠি এবং খেতে লাগি। এক জায়গায় যেয়ে দেখি রক্ত এবং কয়েকটি মাথা পড়ে রয়েছে। আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই। আমরা ভারতে পৌঁছাবার পর এক বাড়িতে আশ্রয় নিই। সেই বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আবার রওনা হই। যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। একটি পুকুরের পাশে এক গাছতলায় অবস্থান করি। রাত্রে সবাই ঘুমাবার পর আমার মেজ ছেলে জলে পড়ে যায়। তখন একজন মহিলা টের পেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, কার ছেলে জলে পড়েছে, তাড়াতাড়ি ওঠ। শুনে আমরা সবাই জেগে উঠি এবং তাড়াতাড়ি তাকে জল থেকে উঠিয়ে দেখি আমার ছেলে। সকাল হলে আমরা খাওয়া দাওয়া করে ১০টার

সময় রওনা হয়ে রানাঘাট যাই। সেখানেই আমরা থাকি। সেখানে আমাদেরকে চাল, গম, আটা, চিনি, চিড়ে, গুড়, মুড়ি, পাউরুটি ইত্যাদি দিত।

বাংলাদেশে যখন যুদ্ধ হয় তখন ভারত সরকার দেখল বাংলাদেশের মানুষ সত্যিই যুদ্ধ করছে। তখন ভারত থেকে সৈন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানিরা দেখল এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে তার সৈন্যেরা সব শেষ হয়ে যাবে। তাই পাকিস্তানি সেনাপ্রধান ভারতীয় সেনাপ্রধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আর তখনই আমরা বাংলাদেশে চলে আসি।

যারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারা মানুষ নয়, অমানুষ। তারা নিজের দেশের কথা না ভেবে অন্যদের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। আমি মনে করি, যারা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে তারা সবাই এই মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার কথা স্মরণ করবে। স্মরণ করবে শহীদ ভাইদের কথা। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সূত্র জ-২৫৪৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রূপালী মোদক	**শান্তিরাম মোদক**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পিতা: মৃত তুষ্টলাল মোদক
পিতা: মৃত অনিল চন্দ্র মোদক	গ্রাম: দিলালপুর, পোস্ট: বহরপুর,
গ্রাম: দিলালপুর, পোস্ট: বহরপুর, জেলা: রাজবাড়ী	রাজবাড়ী, সম্পর্ক- জেঠা

বসে থাকলে দেশ স্বাধীন করা যাবে না

আমি তখন জগন্নাথ কলেজের এইচএসসি-র প্রথম বর্ষের ছাত্র। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন প্রথম সারিতে বসে আমি সে ভাষণ শুনি। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী ঢাকায় আক্রমণ করে। তখন আমি ও আমার পরিবারবর্গ পায়ে হেঁটে পদমদী গ্রামে চলে আসি। কিছুদিন পর আমি বুঝতে পারলাম ঘরে বসে থাকলে দেশ স্বাধীন করা যাবে না। মনে মনে ভাবলাম আমি মুক্তিযুদ্ধে যাব। আমি এগার টাকা ও আমার একটি সোনার আংটি নিয়ে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ি। আমার সাথে আমার দুই খালাত ভাই গিয়েছিল। একজনের নাম নওরোজ, আর একজনের নাম ইকবাল। ইকবালকে ওর ফুফুর বাসায় রেখে আমরা দুই ভাই হাফলং মিলিটারি একাডেমীতে যাই। ওরা আমাদের ট্রেনিং-এর জন্য রিক্রুট করে।

আমরা ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরে কয়েক জায়গায় আক্রমণ চালিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো, আমরা যখন শ্রীপুরে আক্রমণ চালাই তখন পাকবাহিনীর সাথে আমাদের সরাসরি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় একটা গুলি এসে আমার পাশের এক মুক্তিযোদ্ধার মাথায় লাগে। এরপর সে অস্ত্র দিয়ে আমাকে বলল, মতিন তুমি সরে যাও। এক সময় পাকবাহিনী পিছু হটে গেল।

এরপর আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো, আমি মুক্তিযোদ্ধাদের শীতের কাপড় ও জুতা আনতে ঢাকা গিয়েছিলাম। এরপর বাস থামিয়ে তল্লাশি করার সময় বাস থেকে এক একজন করে নামিয়ে পাকবাহিনী কলেমা জিজ্ঞাসা করল। সবাই কলেমা বলতে শুরু করে। কিন্তু সবাই পড়ার পরও একজনকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে ধরে নিয়ে কি করা হলো তা আমি জানি না। এরপর আমি ঢাকা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। যখন আমি বাস থেকে নেমে গেলাম তখন দেখলাম একটা রিকশা। আমি রিকশায় উঠলাম। কিছুদূরে আড়ালে গিয়ে রিকশাটা থামল। রিশাওয়ালা বলল, কোনো ভয় নেই মতিন ভাই। আমি তখন চমকে উঠলাম, বললাম তুমি কে? তার মুখ বাঁধা ছিল গামছা দিয়ে। সে মুখ থেকে গামছা সরিয়ে বলল, আমি। আমি তখন নিশ্চিন্ত হলাম। বললাম ও তুমি, আগে বলবেতো। রিকশাওয়ালা ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা। তারপর সেই রিকশাওয়ালা তার বাড়িতে নিয়ে আমাকে

বলল যে, তুমি কোনো চিন্তা কর না। এই শীতের কাপড় ও জুতা এই বাক্সে রেখে যাও। আমি সকালবেলা পৌঁছে দেব। তারপর আমি চলে এলাম। সে সকালবেলা সেই শীতের কাপড়গুলো পৌঁছে দিল।

এভাবে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর আমাদের দেশ স্বাধীন হলো। বাড়ি ফিরলাম আমি। এই স্বাধীনতা আমার গর্ব, আমার অহংকার।

সূত্র : জ-২৫৮৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোঃ ইমদাদুল হক	**এ এ এম আবদুল মতিন ফেরদৌস**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: পদমদী, পো: পদমদী
শ্রেণি-৬ষ্ঠ, রোল-৪৩, শাখা-ক	উপজেলা: বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী
	সম্পর্ক-চাচা

গলায় ফাঁসি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে

আমার বয়স যখন ৪৫ বছর তখন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হয়। প্রথমে মিলিটারি এসে বহরপুর গ্রামে অবস্থান করে। কয়েক দিন বহরপুর থাকার পর আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে নেমে পড়ে। গ্রামে নেমে তারা গুলি ছুড়তে লাগল। এতে অনেক লোক মারা গেল। আমার ফুফু বাড়ির মাঝে কাজে লিপ্ত ছিল। তখন একটা গুলি এসে তার উরুর উপরে লেগেছিল। কিছু দিন পর তার মৃত্যু ঘটে। তারপর বহরপুর গ্রামের মতিয়ার নামে এক লোককে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে হড়াইড় ব্রিজের কাছে কুপিয়ে হত্যা করে। তেতুলিয়া নামক স্থানের অনেক ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এতে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে। অনেক ছেলেমেয়ে এতিম হয়ে পড়ে। এমতাস্থায় তাদের হাহাকার ও দুঃখের সীমা ছিল না। এরা আমার সম্পর্কে ভাতিজা।

আমার দুঃসম্পর্কের এক বোন ছিল। সে মিলিটারির নির্যাতনের শিকার হয়ে, অবশেষে গলায় ফাঁসি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমার সেই তেঁতুলিয়া গ্রামে যে বাড়িতে আগুন দিয়েছিল সেই বাড়ির অনেক যুবক, মাঝ-বয়সী লোক ও যুবতী ছিল। এদের একজনকে তারা অনেক মারধর করে। ফলে কিছু দিন পর সে মৃত্যুবরণ করে। তিনি আমার চাচা। তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। ৫৭ বছর বয়সে দেশের শত্রুর হাতে মার খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় আমার চাচার। এই যে নরপিশাচ, দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু এদের হাতে আরো অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন।

অবশেষে ৯ মাস যুদ্ধের পর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

সূত্র : জ-২৭৫৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোঃ সাদ্দাম হোসেন	**সালমা বেগম**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	স্বামী-হনেফ আলী মোল্লা
শ্রেণি-৯ম	গ্রাম: চর বহরপুর
রোল-৮, শাখা-ক	বয়স-৮৫, সম্পর্ক-প্রতিবেশী

জীবন্ত মারা গেলাম

১৯৭১ সালে রেল স্টেশন থেকে নেমে পাকবাহিনী ছড়িয়ে পড়ল আমাদের চারদিকে। হিন্দুদের মারতে শুরু করল। এই আমগাছের পাশ দিয়ে মাঠের মধ্যে যাচ্ছিল একটা জেলে। তাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধরে চোখের সামনে গুলি করে মেরে ফেলল। সেখান থেকে আমি সামান্য একটু দূরে ছিলাম। তখন হানাদার বাহিনী

আমাকে দেখে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বলল, শালা হিন্দু না মুসলমান তুই? আমি বললাম, আমি মুসলমান। আমার কথা তারা বিশ্বাস করলো না। তারা আমাকে উলঙ্গ করে দেখল আমি মুসলমান। তখন আমাকে তারা সাথে নিয়ে গেল। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তবু মনে সাহস রেখে তাদের সাথে গেলাম। তারা আমাকে বলল, হিন্দুদের বাড়ি কোথায়রে শালা। আমাদেরকে দেখিয়ে দে। হিন্দুদের মধ্যে না একটা লোক ছিল। তার সাথে আমার খুব খাতির। হিন্দু পাড়ায় ঢুকতে সেই বাড়িটা আগে বাধতো। তার বাড়িটি দেখাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল মনে মনে । তবু কিছু করার নেই! নিজের জানটা বাঁচাবার জন্য আমি বাড়িটা দেখিয়েছিলাম। কারণ, আমি যদি তখন না দেখিয়ে দিই আবার যদি কাউকে জিজ্ঞাস করে হিন্দুদের বাড়ি কোনটা কোনটা, তখন যদি সে আবার বাড়ি দেখিয়ে দেয়, তখনতো আমার বিপদ হতে পারে। সে জন্য বোধহয় বাড়িটা আমি দেখিয়ে দিলাম। হানাদার বাহিনী বাড়ি ঢুকে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে আমার বন্ধুকে গুলি করে মেরে ফেলল। তার সাথে আরও মারলো তার পরিবারের সকলকে। আমার চোখের সামনে আমার বেশ ভালো বন্ধুকে মারা দেখে আমি যেন নিজেই জীবন্ত মারা গেলাম। আমি যেন সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলাম। তাকে মারার পর মারলো গ্রামের সকল হিন্দুকে। এই দৃশ্যটা আমার আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সূত্র : জ-৩১৫২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সোহেল রানা	**মো. সৈয়দ মোল্লা**
রামদিয়া বিএমবিসি উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক-দূর সম্পর্কে দাদা
শ্রেণি-৮ম, রোল-৩১	

একমাত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে

বহরপুর বাজার নিবাসী একজন বিহারি আমাকে ধরে নিয়ে বেঁধে রাখে। আমি বহু কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয় করার পর আমাকে ছেড়ে দেয়। তখন আমি বাড়িতে এসে দেখি কোনো লোক বাড়িতে নাই, তারা অন্য গ্রামে চলে গেছে। তখন আমি রেলপথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে কালুখালী গিয়ে পৌঁছি। তখন এক বিহারি আমাকে ধরে। আমি তার হাত হতেও রেহাই পাই এবং পরে এক মাঝির নৌকায় উঠে নৌকার মাচালের নিচে বসে থাকি। মাঝিকে পাংশা যেতে বলি, সে আমাকে পৌঁছাইয়া দেয়। আমি পাংশায় (নিজ অফিসে) গিয়া দেখি অফিসে তালা বন্ধ।

তখন আমি মাচপাড়া চলে যাই। যাওয়ার পর এম এ মতিন কমান্ডারের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি (ক্যাম্প কলিমহর)। ওইখান থেকে পাংশায় মুক্তিযোদ্ধা দলে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করি। ওখান থেকে পূর্ব রাজবাড়ী চলে আসি এবং রাজবাড়ীতে যুদ্ধ করি। ঐ মুহূর্তে জানতে পারলাম আমার একমাত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। আমি তাকে দেখতে পারিনি। সন্তান মৃত্যুর সংবাদে মন খারাপ হলেও দেশের জন্য তার বেদনা অনুভব করতে পারি নাই। বিদেশী হানাদার বাহিনী আমাদের গোপন আস্তানার সংবাদ পেয়ে যায় এবং গভীর রাত্রে অতর্কিতে হামলা চালায়। আমাদের মধ্যে দ্রুত প্রস্তুতি নেয় মোট ৮ জন। পজিশন নিয়ে পিছন দিকে সরে গিয়ে বিশেষ স্থানে অবস্থান নিয়ে তাদের গতিরোধ করি। পরে আমরা সরে পড়ি। তাদের ভারি অস্ত্রের মুখে আমাদের লোক ও অস্ত্র ছিল একেবারেই কম।

১৩ নভেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় আমাদের এক লোক সংবাদ জানালেন, হানাদার বাহিনী শহরের ৬ জন বিশেষ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের বালিয়াকান্দী ও গোয়ালন্দের সেক্টরে সংবাদ পৌঁছানো হয়েছে। যোগাযোগের অপেক্ষায় আছি। যেভাবেই হোক ঐ ছয় জন স্বাধীনতার পক্ষের লোককে বাঁচাতে হবে। তিন গ্রুপের লোকজন একত্রে রাত ১.৪০ মিনিটে সংঘবদ্ধ হয়ে গোয়ালন্দের ঘাটে আক্রমণ চালাই। তিন

ঘণ্টা গোলাগুলিতে ভোর পৌনে ৫টায় জানতে পাই আমাদের দুই জন লোকের রক্তপাত হয়েছে। এরপরে যুদ্ধবিরতি হয়।

সূত্র : জ-২৫৩৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রুবাইয়া সুলতানা	**মো: সামছুদ্দিন বিশ্বাস**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সাং: বহরপুর, পো: বহরপুর
পিতা - মৃত জমির উদ্দিন বিশ্বাস	উপজেলা: বালিয়াকান্দী, জেলা: রাজবাড়ী
	বয়স-৬৬, সম্পর্ক-নানা

তার পা আর উঁচু হয় না

১৯৭১ সালের সেই সব দুঃখের আবেগ আজ আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে। আমার দাদা বলছিল, আমার নানি **১৯৭১** সালে শিশু সন্তানকে ঘরে রেখে পাশের এক বাড়িতে চাল ধার করে আনতে গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে রেলওয়ের রাস্তা চলে গেছে। পাকিস্তানি হানাদাররা তখন রাস্তায় মেশিনগান চালু করছিল। দ্রুত গতিতে গুলি আসছিল। তাই দেখে আমার নানি দৌঁড়ে ছুটে এলেন তার সন্তানের কাছে। এসে তার সন্তান সাইদকে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নানির হাঁটুতে গুলি ঢুকে গেল। আমার নানি তা খেয়াল করলেন না। কিন্তু তিনি ঠিক সেই স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গুলি আসা দেখে তার স্বামী দৌড়ে মাঠ থেকে বাড়ি এলেন এবং তার স্ত্রীকে বললেন, তাড়াতাড়ি শিশু সাইদকে নিয়ে আমাদের উচ্চ ডোবার পিছনে যাও। তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি রওনা হতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার পা আর উঁচু হয় না। তার পা মাটির সাথে আটকে আছে। তখন তিনি তা দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন এবং বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

গুলি অবিরাম চলছিল। তার মধ্যে তারা কেউ মাথায় পানি ঢালে। আবার কেউ মাথায় তেল মালিশ করে। সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি অসহায় হয়ে পড়লেন। অতঃপর আমার নানি দুই থেকে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে ছিলেন। তার শিশু সন্তান দুধের পিপাসায় চিৎকার করে কাঁদে। রক্তে তার হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত রঙিন হয়েছিল। তারপর তার হুঁশ হলো। দুই থেকে তিন দিন কোনো পানাহার ছিল না। তার সুন্দর দেহ শুকিয়ে যায়। অনেক ওষুধ খেলেন, ডাক্তার দেখালেন। কোনো কিছুতে তার পায়ের ঘা শুকাল না। গুলিটি কিন্তু হাড়ে লাগেনি। আজও তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে বেড়ান।

সূত্র : জ-২৬০৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোঃ আফাজ উদ্দিন	**মোঃ ফরিদ মণ্ডল**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পিতা : আকের আলী মন্ডল
দশম শ্রেণি	সম্পর্ক-দাদা

নিভে গেল দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র

যুদ্ধের প্রায় শেষের দিক। বাংলার চারদিকে তখন হাহাকার। কী দৃশ্য! তারই মাঝে আমার দুই ভাই আবুল ও শফিকের প্রাণপণ যুদ্ধের মধ্যেও ইচ্ছা হলো মায়ের সাথে দেখা করবে। তাদের ইচ্ছা হল যে, যদি একটু মায়ের মুখ দেখতে পেতাম তাহলে মনে হয় যুদ্ধের প্রতি আসক্তিটা বেড়ে যেত। তাহলে বুঝি ফিরে পেতাম পুরো বাংলা মায়ের আদর। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা আসে মাকে দেখতে। বাড়িতে এসে মায়ের সাথে দেখা করে। রাত্রে মা

খেতে বলে কিন্তু তারা বলে, মা আমরা ভোরে তোমার হাতের খাবার খেয়ে আবার যুদ্ধে চলে যাব। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাদের শরীরে ছিল না কোনো বস্ত্র। তাই তারা দুই ভাই তাদের স্ত্রীর পুরো শাড়িটা পরে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রি শেষ প্রায়। এমন সময় তার ছোট ভাই দেখতে গেল তাদের গোয়ালের গরুগুলো। তারই মধ্যে একদল পাকিস্তানি এসে বলে, এই শ্যালায় তুইহে মুক্তিয়া। এই শ্যালায় তোর বড় ভাই কোথায়? করার কিছুই নেই। সে তার বড় ভাই আবুলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তারা ঘরের মধ্য থেকে তাকে বেরিয়ে নিয়ে আসে।

সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধাদের এক কমান্ডার। তারা তাকে নিয়ে যাবার সময় দৌড়ে মাঠের মধ্যে চলে যায়। তবু শয়তানরা তাকে ধরে নিয়ে গাছের সাথে বেঁধে বুকের উপর ছুরি চালায়। অসহ্য সেই ছুরির আঘাতের বদলে তাকে গুলি করতে বলে। তারপর তারা তাকে গুলি করে। বাংলা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হারায়। তাই দেখে তার ছোট ভাই শফিক প্রতিবাদ করে। তাকেও গাছের সাথে বেঁধে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। বয়ে গেল লাল রক্তের সাগর। তিনিও ছিলেন এক অংশের মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার। কিছুদিন পরে দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু পায় না তার দেশমায়ের সন্তান, পায় না তাদের সেই নির্ভিক সাহসী সন্তানদের। নিভে গেল দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র।

সূত্র : জ-২৬৩২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোঃ মিজানুর রহমান	**আমেনা বেগম**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পাংশা, রাজবাড়ী
শ্রেণি-দশম, রোল-৩২	বয়স-৭৫

আজও ফিরে আসেনি

একাত্তরে দেশের স্কুল কলেজের ছাত্র, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ভারতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার সামরিক ট্রেনিং নেয়। পরে নিজের দেশে ফিরে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের দ্বারা এ দেশের সাধারণ মানুষ চরম নির্যাতিত হতে থাকে। তাই আমিও উক্ত সময়ে একদিন আমার তিন বন্ধুর সাথে ভারতে যাওয়ার জন্য রওনা হই। কয়েকদিন হেঁটে যাওয়ার পর কুষ্টিয়া জেলার সান্ধিয়ারা নামক বাজারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টহলরত রাজাকার বাহিনী সন্দেহ করে আমাদের ধরে ফেলে এবং চেয়ারম্যানের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারা আমাদের উপর বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, আমরা ভারতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নেওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। উক্ত বাড়িতেই ছিল রাজাকারের ক্যাম্প। সেখানে আমাদের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন চলতে থাকে। রজব আলী নামক এক ব্যক্তি ছিল ওই বাড়িতে বসবাসরত চেয়ারম্যানের ভাগনে। সে ছিল রাজাকারদের সহকারী কমান্ডার। চেয়ারম্যান সাহেব ওই সময়ে বাড়িতে না থাকায় ঐ জায়গার সমস্ত দায়িত্বই ছিল তার হাতে। তাই তার কাছে আমরা জীবন ভিক্ষা চাই এবং আমরা তার কাছে বলি আমরা আর ভারতে যাব না, বরং বাড়িতে ফিরে যাব। একদিন এক রাত পর আমাদের বাড়িতে যাওয়ার অঙ্গীকার-পত্র নিয়ে রজব আলী করুণা করে আমাদের ছেড়ে দেয়। আমরা চার জনই বাড়িতে ফিরে আসি। আবার রাজাকার, আলবদরদের ভয়ে একদল শরণার্থীদের সাথে আমরা চার জনই ভারতে রওনা হই। সাত রাত সাত দিন ধরে হাঁটার পর কোনভাবে জীবন নিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। একদিন পর আমাদের চার জনের মধ্যে দুইজন হারিয়ে যায়। পরে দুইজন কল্যাণী ক্যাম্পে যাই এবং সেখানেই থাকি। আমরা

সেখান থেকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যাই এবং তাদের সঙ্গে থাকি। কিন্তু আমাদের বয়স অল্প হওয়ায় আমরা অস্ত্র ট্রেনিং নিতে পারিনি। আমরা শুধুমাত্র তাদের সহযোগিতায় থাকি।

কিছুদিন পর মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতার জন্য আমাদের দুইজনকে দেশে পাঠানো হয়। দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকা মুক্তিবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীকে আমরা সহযোগিতা করতে থাকি। এমতাবস্থায় দেশে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন আমরা বিভিন্নভাবে জয়ী হতে থাকি। কিছুদিন পরে ভারত সরকার আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। আমরা অনেক শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে যুদ্ধ করতে থাকি এবং অনেক জায়গায় আমরা জয়ী হতে থাকি। এক সময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এভাবেই বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। আমরা দুইজন আজও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বেঁচে আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সেই সময়ের হারিয়ে যাওয়া পথের সাথী দুইজন আজও ফিরে আসেনি। মনে করি, হয়ত তারা বেঁচে নেই!

সূত্র : জ-৪৭০৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো: মেহেদী হাসান	**মো: হাসেম আলী**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক-পিতা
শ্রেণি-দশম, রোল-০৮	

পাক সেনারা গলা কেটে দিয়েছে

১৯৭১-এর সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির কথা বলতে গেলে গা শিউরে উঠে। তখন পাক হানাদারদের চরম অত্যাচার। চারদিকে আগুন আর আগুন। পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। শহর থেকে তারা ক্রমান্বয়ে গ্রামের দিকে ছুটে আসছে। বিশেষ করে হিন্দু এলাকার দিকে তাদের নজর। দিনটির কথা সঠিক মনে নেই। তখন আমের মৌসুম। পাক সৈন্যরা পাংশা স্টেশন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মৃগী বাজারের দিকে আসছে। পথিমধ্যে যেখানে হিন্দু এলাকা পাচ্ছে পুড়িয়ে, অত্যাচার করে যাচ্ছে। পথে বাগদুল নামক জায়গায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক গরিব বেচারিকে রাইফেলের মাথায় থাকা বেয়নেট দিয়ে গলা কেটে দেয়। গলা কাটা অবস্থায় সে আমাদের বাড়িতে আসতো। কথা বললে গলা দিয়ে ভোস ভোস করে কথা বেরিয়ে যেত। পরে গলা সেলাই করে ভালো হয়ে যায়।

সূত্র : জ-৪৩২০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো: রাসেল খান	**মো: আবু তাসের খান**
মীর মোশাররফ হোসেন কলেজ	গ্রাম: খরখড়িয়া, পোস্ট: মৃগী
ব্যবসায় শিক্ষা, ১ম বর্ষ, রোল-৯	জেলা: রাজবাড়ী
	সম্পর্ক-চাচা, বয়স-৫০

রাজাকাররা দেশের ভাল চায়নি

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার রয়েছে সুদীর্ঘ রক্তঝরা ইতিহাস। এ স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া বা বদান্যতার উপহার নয়। এক সাগর রক্ত ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা। এ দেশের সর্বস্তরের জনগণ এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তারা কেউবা চাকরিজীবী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, নারী, এমন কি ১২-১৩ বছরের ছেলেরও। তারা দেশের টানে এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। এদের মাঝে কেউ শহীদ হন, আবার কেউবা তাদের মায়ের বুকে ফিরে আসেন। আর এই পবিত্র মাতৃভূমিকে যারা প্রাণের বিনিময়ে, ত্যাগের বিনিময়ে রক্ষা করেছেন তাদের সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো ধারণা নেই, তবে এতটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, তারা এই পবিত্র মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছেন তাদের ভালোবাসার টানে। আজ এই স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জানার জন্য ও কিছু লিখার জন্য ডাক পড়েছে আমাদেরই মত ছাত্র-ছাত্রীর। এই ডাকের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি ঘটনার কথা বলতে চাই।

ঘটনাটির কথা সংগ্রহ করা হয়েছে '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা মো. ফজলুর রহমানের কাছ থেকে। জানতে চাইলাম তার সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা। সেই সময়ে তিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। পাক হানাদারদের অত্যাচার-অবিচার সহ্য না করতে পেরে, স্কুল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা কয়েক বন্ধু মিলে, প্রতিরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালান। অনেক ক্ষেত্রে তারা সার্থক হন। তারা নিরাশ হননি। তারা বার বার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। কারণ তারা মনে করলেন, যেভাবেই হোক আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতেই হবে। তখনই তারা চললেন বাংলাদেশ ছেড়ে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতে। কিন্তু ভারত যাওয়ার সময় দেখেন যে, বর্ডারে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা। তবু তাঁরা বর্ডার পার হয়ে ঢুকলেন ভারত রাজ্যে।

ভারতের সেনাবাহিনীর একজনের নাম অমর চাঁদ। তার সহায়তায় তারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দেন। সেখানে যথাসময়ে প্রশিক্ষণ শেষ করেন। তারপর তারা বাংলাদেশে ফিরে এসে ৭নং সেক্টরে যোগদান করেন। ওই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন মেজর গিয়াস উদ্দিন। তারা ৭নং গ্রুপের আকবর হোসেন-এর সাথে কাজ করতে লাগলেন। ফজলুর রহমান-এর বাল্যবন্ধু ছিল নোয়াব আলী মোল্লা। তার আরো একজন বন্ধু ইকবাল এসে তাদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। বেশির ভাগ সময় তারা পাবনার নগরবাড়ি আতাইকুলা অবস্থান করেন। পাকসেনা কিভাবে কোথায় অবস্থান করে এবং তাদের দোসর দালালেরা কবে কখন কোথায় অপারেশনে যাবে সেই সবের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন ফজলুর রহমান। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পাক সেনাদের কথাবার্তা, কার্যকলাপ দেখে দলের লোকদের জানাতেন। আর তাদের নিয়ে গোপনে গোপনে অগ্রসর হতেন। দিনের বেলায় তারা চলতেন দিন মজুরের বেশে। বাংলাদেশের বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় ও মাঠে-ঘাটে ছিল তাদের চলাচলের স্থান।

একদিন আতাইকুলার ৮ মাইল উত্তরে শত্রু সেনারা আক্রমণ চালাল। গিয়াস উদ্দিনের দল সেখানে বাধা দিলে উভয় পক্ষেই আড়াই ঘণ্টা গোলাগুলি হয়। পাক সেনারাও দালালসহ আক্রমণ চালায়। দুজন শত্রুসেনা মারা যায়। দালাল ও পাকসেনারা পাবনার ঘাঁটিতে চলে যায়। এ দেশের দালাল রাজাকাররা কখনই এ দেশের ভাল চায়নি। একদিন দোগাছি নামক এক স্থানে রাজাকার ও মিলিটারিদের সাথে তাঁদের এক ঘণ্টা গোলাগুলি হয়। গুলিতে দুই জন মিলিটারি ও চার জন রাজাকার নিহত হয়। মেজর গিয়াসের দলের দুই জন শহিদ হন। এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে সারা বাংলাদেশে। কে কোথায় কি করল তার কোনো খবরই নেই। শুধু সবার মনে একটিই ভাবনা, কখন যে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে।

বাংলাদেশ স্বাধীনের ঠিক একদিন আগে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পাবনা জেলার সুজানগর থানায় আক্রমণ করবেন। গিয়ে দেখেন থানার চারদিকে কড়া পাহাড়া। ওই থানায় সেই দিন পাক বাহিনী ছিল প্রায় ৫০-৫৫ জন। আর ১০-১২ জন ছিল দালাল ও রাজাকার। গিয়াস উদ্দিন তার দলকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করলেন। মুক্তি সেনা ছিল প্রায় ২৫০ জন। নোয়াব আলী মোল্লা, ইকবাল এবং ফজলুর রহমান পড়েন একই দলে। দুলাভাই ছিলেন তাদের দলপতি। রাত ১১টার সময় চারদিক থেকে থানাকে লক্ষ্য করে গুলি পাল্টাগুলি চলতে থাকে।

এইভাবে চলতে থাকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। এই গোলাগুলিতে শহীদ হন তারই দুলাভাই। তারা দুলাভাইয়ের লাশ কোনো মতে শত্রুদের নাগাল হতে সরিয়ে আনেন।

তাদের মাঝে খুব একটা আতংকের সৃষ্টি হয়। সকালে তাঁরা শুনতে পান দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখনও সুজানগর থানা শত্রুমুক্ত হয়নি। কিছুক্ষণ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ১১টায় সুজানগর থানা শত্রুমুক্ত হয়। কয়েকজন শত্রুসেনা যা ছিল তারা বন্দি হয়।

তারপর তাঁরা জেলা হেড অফিস পাবনায় যান। সেখানে তাদের অস্ত্র জমা দিতে হয়। আরো জানতে চাইলে তিনি বলেন তার বন্ধুদের খোঁজ অনেকেরই অজানা। তারা কোথায় রয়েছে কে জানে? তার বন্ধুদের মধ্য বেঁচে আছেন শুধু ইকবাল। তিনি তার গ্রামের বাড়িতে সেখানে গিয়ে দেখেন তার মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ জীবিত নেই। শুধু রয়েছে তাদের স্মৃতি।

সূত্র : জ-২৪৮৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রাহাদ আহম্মেদ (রাজু)	**মোঃ ফজলুর রহমান**
পাংশা জজ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: সত্যজিতপুর, ডাকঘর+থানা: পাংশা
শ্রেণি-দশম, রোল-৩৭	জেলা: রাজবাড়ী
	বয়স-৬৩

বেঁচে আছে খায়ের ও বিলাত

অনেক দিন আগের কথা। ১৯৭১ সালের তারিখগুলো মনে নেই। যখন হানাদার বাহিনী আসত তখন আমরা সবাই ভয়ে লুকাতাম। আমাদের গ্রাম থেকে কত লোক ধরে নিয়ে যেত। অনেককে আবার গুলি করে মারত। তখন মানুষ মেরে, আমাদের একটা নদী আছে সেই নদীতে ফেলে দিত। নদীটির নাম চন্দনা। তখন আমাদের গ্রামের চারপাশে ছিল পানি। তাই পাকবাহিনী খুব কম আমাদের এখানে আসত। আমাদের বহরপুর বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের এখান থেকে লোক ধরে নিয়ে যেত। তাদেরকে তেঁতুলিয়া ব্রিজের ওখানে মেরে ফেলে রাখতো। একবার এসে আমাদের বাজার থেকে গুড়ের কোলা নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে দেখে বলে, এগুলো টেনে নিয়ে যা। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের এখান থেকে হানাদার বাহিনী রামদিয়া চলে গেল। ওখানেও আগুন ধরিয়ে দিল এবং অনেক হিন্দু লোককে মেরে ফেলল। ওরা বোয়ালমারী যায়, ওখানেও বাজার পুড়িয়ে দিল। সেটি ছিল কুমার নদের পাড়ে। একদিন আমরা কয়েকজন ট্রেনে ছিলাম। সেই ট্রেনে ওরা ছিল। ওরা ট্রেন থেকে অনেক লোক ধরল। তারপর বাড়িতে এসে শুনি মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকজন হানাদারকে মেরেছে আমাদের বহরপুর স্কুলে। ওখানে ক্যাম্প ও তহশিল অফিস ছিল। আমার ভাইস্তা খায়ের আলম, গোপাল, বিলাত ও আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাদের ভয়ে আমাদের গ্রামে হানাদার খুব কম ঢুকত। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল খুব সাহসী। তারা কোনো কিছুকে ভয় পেত না। একবার মুক্তিযোদ্ধা খায়েরকে হানাদার বাহিনী ধরার জন্য তাড়া করল। তখন খায়ের এক দৌড়ে একটি পানের বরজে ঢুকে গেল। সে এত জোরে দৌড়াল যে তার বুকের সাথে লেগে অনেকগুলো বাঁশ ভেঙে গেল। এসব মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বেঁচে আছে খায়ের ও বিলাত।

সূত্র : জ-২৫৭৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শারমিন আক্তার মুক্তা	**মো. খলিলুর রহমান**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: বাড়াদী বহরপুর, থানা: বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী
পিতা-শাজাহান রহমান	সম্পর্ক-দাদা
গ্রাম: বাড়াদী, পোস্ট: বহরপুর	

মন বারবার কেঁদে উঠল

সেই সব কাহিনী মনে পড়লে আজও মন শিউরে ওঠে। আমি বিয়ে করেছি কয়েক বছর হলো। ১৯৭১ সালের জুন মাসের ১৭ তারিখে আমার সাথে আরো কয়েকজন ট্রেনিং নিতে ভারতে রওনা হলাম। আমরা ৪২ জন ফায়ার ট্রেনিংয়ে ভর্তি হলাম। কয়েক সপ্তাহ থাকার পর ভারত থেকে অস্ত্র দিয়ে আমাদের বাংলাদেশে পাঠানো হলো। আমিসহ ১৯ জন বয়রাতলী বর্ডার হয়ে বাংলাদেশে পা রাখলাম। সেখানে কিছু অপারেশন করে মধুমতি নদী পার হয়ে বোয়ালমারী বাজারের পাশে চৌধুরী বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। কয়েক দিন এখানকার বাজারের বিভিন্ন রাজাকার, খানসেনা ও বিহারিদের ওপর আক্রমণ করা হলো। তারপর মুক্তার সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়। সেখানে কয়েক দিন থাকার পরে দোকাপাড়া মফেজ মণ্ডলের বাড়িতে ওঠি। তারপর আবার বহরপুর বাড়াদি বানী হয়ে এরেন্দা যাই। গিয়ে ওইখানে ক্যাম্প করি। স্থানীয় কিছু লোক নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর শোনা যায় যে, কিছু রাজাকার, খানসেনা ও বিহারি অনেক ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেককে মারধর করেছে এবং অনেককে মেরেই ফেলেছে। ওই সংবাদ আমাদের দলের কমান্ডার বাকাউল হাসেমের কানে পৌঁছে। তিনি আমাদের সবাইকে অস্ত্র তুলে নিতে বলেন, কারণ আমাদেরকে পাল্টা জবাব দিতে হবে। তাই আমরা অস্ত্র তুলে নিলাম। আক্রমণ করা হলো। আক্রমণে খানসেনা, রাজাকার ও বিহারিরা সবাই পালায়। একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় ঝোঁপের ভেতরে। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর ৮ নং সেক্টরের কমান্ডার আমাদের সবাইকে ডেকে বললেন, আমরা দুই দিনের ভেতর রাজবাড়ী আক্রমণ করব। সেই অনুযায়ী ৮ নং সেক্টরের সবাই রাজবাড়ী আক্রমণ করলাম। ওই দিন থানা, বাজার এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তে এসে গেল। কিন্তু সন্ধ্যায় আবার আমাদের শত্রু-সেনা অতর্কিত আক্রমণ করে রাজবাড়ী দখল করল। ফের আক্রমণ করে রাজবাড়ী দখল করলাম এবং যে যেভাবে পারল তাদের হত্যা করলো। অনেকে পালিয়ে গেলো। রাজবাড়ী আবার মুক্তি বাহিনীর আয়ত্তে আসল। কয়েক দিন পর খবর আসল ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখন আমরা সবাই মুক্তির আনন্দে মেতে উঠলাম। কয়েক দিন পর মিলিটারি ক্যাম্প হলো। আমিসহ সবাই এই ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিলাম। সবাই ফিরে গেল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে। কিন্তু মন বারবার কেঁদে উঠল তাদের জন্য যারা আমাদের সাথী হিসেবে যুদ্ধ করল, একাত্তরে বিলিয়ে দিল জীবন।

সূত্র : জ-২৬৩৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. খোকন সেখ	**আবুল খায়ের**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: বাড়াদী
দশম শ্রেণি	সম্পর্ক: নানা

মরা মায়ের দুধ খাচ্ছে

ফাল্গুন মাস থেকে এই যুদ্ধ শুরু। বিদ্যুৎ ছিল না। কেরোসিন তেল পাওয়া যেত না। রাত হলেই আকাশের ওপর দিয়ে প্লেন ওড়া দেখে দৌড়ে গিয়ে কোথায় পালাব তার কোনো ঠিক-ঠিকানা করতে পারতাম না। তখন আমরা মাটির নিচে গর্ত করে রেখেছিলাম। ছেলেপেলে নিয়ে আমরা সেই গর্তের মধ্যে লুকাতাম। যখন কোনো শব্দ

থাকত না তখন আমরা গর্ত থেকে বের হয়ে আবার বাড়ি আসতাম। ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে চৈত্র মাস শুরু হলো। এ রকম অবস্থায় চৈত্র মাস গেল। বৈশাখ মাসের ৬ তারিখে যখন ঘরবাড়ি ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিল, তখন আমরা প্রাণের ভয়ে রওনা দিলাম। সবকিছু ফেলে যার যার পরনে যা ছিল তাই নিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। কোথায় যাব তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এর মাঝে কত মরা যে পার হয়ে গেলাম। মা মরে গেছে জীবিত বাচ্চা তার দুধ খাচ্ছে। মৃত কাউকে কাঁধে নিয়ে মায়ের হাত ধরে চলছে জীবন রক্ষার জন্য। কত বুড়ো মানুষ ও কত বাচ্চারা মারা গিয়েছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উঠলাম ভারতে। তিন দিন তিন রাত পরে আমরা রেশন কার্ড ও হোগলা পাতার ঘর পেলাম। ভারতের রাজা ইন্দ্রাগান্দি। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের সৈন্যরা আমাদের ২ কিলু চিড়ে ও হাফ কিলু গুড় খেতে দিল। আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলেমিশে খেলাম। ভারতে আমাদের শুধু বাংলাদেশের কথা মনে পড়ছিল। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের কথা। ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ১০ মাসে আমরা বাংলাদেশে আসি। তখন ভারতের রাজা আমাদের বিনা পয়সায় একটি ট্রেন দিলেন। সেই ট্রেনে চড়ে আমরা বাংলায় ফিরে আসলাম। তখন বাংলাদেশে চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আমাদের ঘর তৈরি করার জন্য ১২টি টিন দিলেন। ২৫০ টাকা দিলেন। আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করে নিলাম। আমাদের ঘর হলো বাড়ি হলো আবার সংসার হলো। এভাবে আমরা বাংলায় বসবাস করতে লাগলাম।
কত সুন্দর বাংলাদেশ। গাছপালার ছায়ায় ভরা আমাদের এই সুন্দর বাংলাদেশ! আমি বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

সূত্র : জ-২৬৪৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সুলতা রানী শর্মা	**মুকুল রানী শর্মা**
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স-৬৫
গ্রাম: নারায়ণপুর, পোস্ট: বহরপুর	
থানা: বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী	

চোখ কাটা ডাক্তার পালিয়ে যায়

আমি তখন বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণিতে পড়ি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকবাহিনী যে বাংলাদেশের বড় বড় শহরে অন্যায় অত্যাচার চালাচ্ছে এই কথা শুনতে পাই। কয়েক দিন এভাবেই কাটে। সঠিক তারিখ আমার মনে নেই, হয়তো বা এপ্রিলের ২ কিংবা ৩ তারিখ পাকবাহিনী আরিচা ঘাট পার হয়ে গোয়ালন্দ ঘাটের কয়েক কিলোমিটার দূরে চরে নেমে নদীর তীর দিয়ে দৌড়ে আসতে থাকে। এলাকার সাধারণ জনগণ তাদের হালকা-পাতলা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করতে গিয়ে পাকবাহিনীর অস্ত্রের বিশালতা দেখে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। পাকবাহিনী বিনা বাধায় গোয়ালন্দ ঘাট পার হয়ে রাজবাড়ী এসে বড় ধরনের ক্যাম্প করে বসে। একদিন পাংশা ও কালুখালীর মাঝখানে কালকেপুর নামে এক ব্রিজের নিচ থেকে ওই এলাকার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর ওপর হামলা করে। রাজবাড়ীতে যেসব বিহারি ছিল তারা পাকবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে মুজাহিদ নামে সাধারণ জনগণের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালায়। অনেক মা-বোনের ইজ্জত লুটে নেয়। পাকবাহিনী রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে। বহরপুর স্কুলেও ছোট একটি ক্যাম্প বসায়। এখানে ছিল মাদ্রাজি 'চোখ কাটা ডাক্তার' নামে এক ডাক্তার। তার ছেলের নাম মাইক এবং তার ভাতিজার নাম ছিল মাজেদ। তারা তিনজন অস্ত্র সংগ্রহ করে এই এলাকার মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। তারপর মুক্তিবাহিনী আসার পরে রামদিয়ার আজিজ সরদার নামে এক রাজাকারকে তারা মেরে ফেলে। বালিয়াকান্দি থানা ছিল এক বিহারির অধীনে। মুক্তি বাহিনী থানা এবং বহরপুরের এই ক্যাম্প আক্রমণ করে দখল করে। অনেক অস্ত্রশস্ত্র হস্ত

গত করে। চোখ কাটা ডাক্তার পালিয়ে যায়। বহরপুরে ক্যাম্প আছে মনে করে এখানে বোমবিংয়ের ব্যবস্থা করে মুক্তিবাহিনীর হাই কমান্ড। তাই ভারতীয় তিনটি বিমান এসে বহরপুর স্কুলের আশপাশে বোমা মারতে থাকে কিন্তু কোনো লোক নিহত হয়নি। আহত হয়েছিল কয়েকজন লোক। এতে স্কুলের কোনো ক্ষতি হয়নি। এভাবেই চলে আসে ১৬ ডিসেম্বর এবং ওই দিনে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পন করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : জ-২৭৫৯

সংগ্রহকারী
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়
৯ম শ্রেণি, শাখা-ক, রোল-১৬

বর্ণনাকারী
মোঃ আঃ ছত্তার সেখ
বহরপুর, বাজবাড়ী
সম্পর্ক-বাবা

ছেলের জন্য কান্নাকাটি করেন

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা হওয়ার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আমার নানা আ. গফুর শেখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার নন্দলালপুর ইউনিয়নের আওতাধীন সোন্দাহ গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। কিন্তু নানার হৃদয়ে ছিল স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নানার মামাতো শ্যালক আ. রাজ্জাক নানাবাড়িতে লজিং থেকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে লেখাপড়া করতেন। তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সর্বদা সহযোগিতা করেছেন। কুষ্টিয়া গড়াই নদের দুই প্রান্তে কয়েক দিন প্রতিরোধের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নদী পার হয়ে আমার নানাবাড়ির এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমার নানা পরিবার-পরিজন নিয়ে পার্শ্ববর্তী বড়ুরিয়া গ্রামের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পালিয়ে যাওয়ার সময় আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র চার বছর। মা গ্রামের একজন মহিলার কোলে চড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাকিস্তানি বাহিনীর এলোপাথাড়ি একটি গুলি মায়ের কানের পাশ দিয়ে পার্শ্ববর্তী বাঁশ বাগানে গিয়ে পড়ে। সেই সময় শত্রু সেনাদের গুলিতে মাঠে থাকা অনেক গরু ও ছাগল মারা যায়। নানা আরো জানালেন, শত্রুসেনার ভয়ে যখন বাড়ির সকলেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন তখন তাঁর একজন প্রতিবন্ধী শ্যালক আমজাদকে ফেলে রেখে যান। অন্য গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার পর আমজাদের মা তার প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য খুবই কান্নাকাটি করেন। পরের দিন আ. রহমান নামে একজন প্রতিবেশী এসে দেখেন, একটি পেয়ারা গাছের গোড়ায় বসে সে কান্নাকাটি করছে। তিনি তখন তাকে কাঁধে করে তার মায়ের আশ্রয় নেওয়া বড়ুরিয়া গ্রামে নিয়ে যান।

কিছুদিন অন্য গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার পর আমার নানা গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বাড়িতে একটি বাংকার তৈরি করেন। অতপর পরিবারের সবাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেই সময় কুমারখালী থানার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আ. রাজ্জাক আমার নানার বাড়িতে তার বাহিনীসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে পলাতক থাকতেন এবং রাত্রে অপারেশন করতে বের হতেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময় স্থানীয় পিচ কমিটির (শান্তি কমিটি) নেতা এবং স্বাধীনতার শত্রুরা স্থানীয় হিন্দুদের ও মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে লুটপাট করেছিল। সেই সকল ব্যক্তিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাক সাহেব ধরে এনে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আইয়ুব আলী বিশ্বাসের বাড়িতে আটকে রাখতেন। স্বাধীনতা শত্রুদের তিনি স্বাধীনতার স্বপক্ষে আনবার জন্য সুযোগ দিতেন এবং লুটপাট করা মালপত্র ফেরত দিতে বাধ্য করতেন। আমার নানা মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাক

ও তার বাহিনীকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। একদিন আমার নানা মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাকের গ্রামের বাড়ি কুমারখালী থানার কল্যাণপুর গ্রামে যান। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতে অপারেশন করার সময় তাদের হাতে তিনি গ্রেফতার হন এবং তাকে মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাক সন্দেহ করে গুলি করার জন্য উঠানে বসিয়ে রাইফেল বুকে ঠেকান। সেই সময় ওই গ্রামের আরও কয়েক জন যুবককে ধরে এনে তার পেছনে লাইন দিয়ে বসায়। তখন একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইনফরমার তাদেরকে অবহিত করে যে, উনি মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাক নন। তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয়। আমার নানা দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে সার্বক্ষণিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন ও সকল প্রকার খবরাখবর সরবরাহে সহযোগিতা করেছেন। তিনি একদিন সংবাদ পেলেন মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাকের বাড়িতে শত্রু সেনারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার নানা উক্ত মুক্তিযোদ্ধার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কল্যাণপুর গ্রামে ছুটে যান। সেখানে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শোকার্ত পরিবারকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

আমার নানা তার স্মৃতিচারণ করে জানালেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একদিন শীতের রাত্রে শত্রু সেনারা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আ. রাজ্জাকের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তখন তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির পেছনে কচুরিপানায় ভরা ডোবার মধ্যে নাক জাগিয়ে ডুব দিয়ে সারারাত কাটান। শত্রু সেনারা তাকে ধরতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় উক্ত গ্রামের লোকজনদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করে এবং অনেক গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। আমার নানা আরো জানালেন, শত্রুর গোলাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি এমনভাবে বাংকার তৈরি করেছিলেন, যেন ওপর থেকে বোঝা না যায় যে এ বাড়িতে একটি বাংকার আছে। বাংকারের ওপরে কাঠের তক্তা দিয়ে, তার ওপর মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। উক্ত বাংকারে গ্রামের লোকজন, কখনো মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় গ্রহণ করত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাক ও তার বাহিনীকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন।

সূত্র : জ-২৫০৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নুসরাত জাহান (মহুয়া)	**আ. গফুর শেখ**
পাংশা জজ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক-নানা
শ্রেণি: ৯ম, রোল: ১০	

দেশ স্বাধীন করা ছিল তার প্রতিজ্ঞা

কামারখালী ঘাটে যুদ্ধের পর পাকবাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে গোয়ালন্দ ঘাট পার হয়ে ঢাকার দিকে রওনা হওয়ায় আমরা নিরাপদ বোধ করছি। ১৪ ডিসেম্বর খবর পাওয়া গেল বিভিন্ন দিক থেকে পলাতক বিহারি রাজবাড়ী রেলওয়ে কলোনিতে বসবাসরত বিহারিদের সাথে একত্র হয়ে সৈয়দ খামারের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়েছে। আর মাঝে মাঝে আক্রমণ চালিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা এবং বাঙালিদের দোকানপাটে আগুন দেয়া শুরু করেছে। এই সংবাদ পেয়ে গোয়ালন্দ মহাকুমার চারটি থানার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা রাজবাড়ী শহরের আশপাশে সমবেত হয়। পাংশা থানার মুজিব বাহিনীর প্রধান মতিন ভাইকে রাজবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করার জন্য আহ্বান জানায় তারা।

১৪ ডিসেম্বর আমরা মাছপাড়া রেল স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে মতিন ভাইয়ের নেতৃত্বে রেললাইনের ওপর দিয়ে রাজবাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পাংশা, কালুখালী, বেলগাছি, সূর্যনগর রেলস্টেশন ও রেললাইনের দুপাশের গ্রামগুলো থেকে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ এমনকি শিশুরাও হেঁটে এসেছে মুক্তিবাহিনীর দলগুলোকে এক নজর

দেখার জন্য। আমরা রেললাইনের পাশ দিয়ে বীরদর্পে রাজবাড়ীর দিকে হেঁটে যাচ্ছি। গ্রামাঞ্চলের সব লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের এসেছে বরণ করতে এবং উৎসাহ দিতে।

সেই সঙ্গে শ্লোগান দিচ্ছে, জয় বাংলা! কি অভাবনীয় দৃশ্য! প্রচণ্ড আবেগ-উত্তেজনায় যেন টগবগ করছে ওরা সবাই। দূর থেকে দেখতে পেলাম রাজবাড়ী শহরের ওপর আগুনের লেলিহান শিখা। সূর্যনগর রেলস্টেশন থেকে জানতে পারলাম, বিহারিরা বাতেন ক্লথ স্টোর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমরা সেই আগুনই দূর থেকে দেখতে পেয়েছি। আমরা রাজবাড়ী শহরের পশ্চিম দিকে সেলিমপুর প্রাইমারি স্কুলে রাত ৯টার দিকে পৌঁছাই। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে রাত ১১টার দিকে সিদ্ধান্ত হয় আমাদের এ স্থান ত্যাগ করে শহরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে লোকোসেডের দিকে অবস্থান নিতে হবে। কারণ ওই দিকটায় বিহারিরা রেললাইনের ওপর তিন চার লাইন করে ট্রেনের বগি দাঁড় করিয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। রাত ১টার মধ্যে আমরা ৫০-৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং সহযোদ্ধা লক্ষ্মীকোলে শওকত চেয়ারম্যান-এর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের আগমনের সংবাদ রাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় ঢাল, লাঠি, তরবারি নিয়ে শত শত মানুষ ছুটে এসেছে যুদ্ধে যোগ দিতে। মুক্তিবাহিনী দেখে তাদের সাহস এতই বেড়ে গেছে যে তারা এ সমস্ত দেশি অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধে যোগদান করবে। তারপর ৪/৫টি প্যাট্রল দল বেরিয়ে গেল বিহারিদের অবস্থান রেকি করতে।

ভোর ৪টার দিকে সিদ্ধান্ত হলো, এখনই শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। তাই আক্রমণও শুরু হয়ে গেল। আমাদের বাহিনী লোকোসেডের কাছে ইসাক মুন্সির ইটভাটা ও বাঁশ বাগানের পাশে অবস্থান নিয়েছে। ফায়ার ওপেন হলো। ফায়ার চলছে এবং বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশায় আশপাশে কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় ইটভাটার পশ্চিম প্রান্ত থেকে জয় বাংলা শ্লোগান দিলে একদল এগিয়ে আসছে। তারা এক সময় ফায়ার বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাল। আর তারা নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলে অবহিত করল। মতিন ভাই গুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। পেছন থেকে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই হঠাৎ করে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। আত্মরক্ষার্থে প্রত্যেকে গুলি বর্ষণ করতে করতে পিছু হটতে শুরু করল। কিন্তু রফিক, শফি ও সাদিক ভাই আমাদের সবাইকে নিরাপদে পিছু হটতে বলে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ভুল সিদ্ধান্তের জন্য যা ঘটার তা ঘটে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় একত্রিত হই। কিন্তু রফিক, সাফিক ও সাদিক ভাইকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভোরবেলাতে সংবাদ পাওয়া গেল তিনটি মাথাবিহীন লাশ ইটভাটার পাশে পড়ে আছে। এই তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা চিরনিদ্রায় শায়িত আছে রাজবাড়ীর লক্ষ্মীকুল জামে মসজিদের পাশে। সাদিক ভাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন করা ছিল তার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু স্বাধীনতার সূর্য উদয়ের একদিন আগেই তিনি শহীদ হন। তার আর সেই স্বাধীন দেশের সূর্য উদয় দেখা হলো না।

সূত্র : জ-২৫০৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নুসরাত জাহান চাঁদনী	**মো. মুজিবুর রহমান**
পাংশা জজ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: বৃত্তিডাঙ্গা, পোস্ট: পাংশা
শ্রেণি: ৮ম, রোল: ৬	জেলা: রাজবাড়ী
	বয়স: ৫৫